অদিতির উপাখ্যান

অদিতির উপাখ্যান

প্রফুল্ল রায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
সুফি

প্রথম মুদ্রণ
বৈশাখ ১৩৬৮

অদিতির উপাখ্যান

'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে আজ প্রবল উত্তেজনা। শ-পাঁচেক মেম্বারের প্রায় সবাই দুপুর একটার মধ্যে চলে এসেছে। আশা করা যাচ্ছে, দুটোর ভেতর বাদবাকিরা এসে পড়বে। কেননা সভাপতি অমিতাদি তিনদিন আগেই বোর্ডে নোটিশ টাঙিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন, আজ যার যত জরুরি কাজই থাক, সব ফেলে প্রতিটি মেম্বারকে দুটোর মধ্যে অফিসে হাজির হতে হবে। শুধু টাইপ-করা নোটিশ লাগিয়েই বসে থাকেননি অমিতাদি, প্রতিটি সদস্যকে আলাদা আলাদা করে আসতে বলেছেন। যাদের এ কদিন অফিসে দেখা যায়নি, তাদের বাড়ি বাড়ি লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছেন।

'নারী-জাগরণ' মেয়েদের একটি সমিতি। সমাজের সকল স্তরে নারীর মর্যাদা এবং সম্মান রক্ষার জন্য এরা কাজ করে চলেছে। নারী প্রগতি, নারী স্বাধীনতায় এরা বিশ্বাসী। মেয়েদের ওপর যেখানেই অন্যায় বা নির্যাতন চলে সমিতি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। মেয়েরা পারিবারিক এবং সামাজিক দিক থেকে কোন লেভেলে পড়ে আছে সে সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব এরা নিয়েছে।

'নারী-জাগরণ'-এর মেম্বার প্রধানত মহিলারাই। তবে সমধর্মী কিছু পুরুষ, যারা ভারতবর্ষের মতো পিছিয়ে-থাকা দেশে মেয়েদের হাজার রকম সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে—এই সমিতির সভ্য হয়েছে। এরা সমাজের সকল স্তরে মেয়েদের সমানাধিকার দাবী করে। পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরা একই রকম মর্যাদা নিয়ে চলবে, এটাই তাদের কাম্য। এর জন্যই তাদের নিরন্তর লড়াই।

'নারী-জাগরণ'-এর অফিসটা দক্ষিণ কলকাতার নিরিবিলি এক রাস্তায়। বড় কম্পাউন্ডওলা একতলা বাড়ি, সামনে অনেকটা খোলামেলা জায়গা জুড়ে সবুজ ঘাস। চারিদিকে প্রচুর গাছপালা এবং অসংখ্য পাখি। কলকাতার মতো শহরে যেখানে প্রতিদিন 'পপুলেশন এক্সপ্লোসান' অর্থাৎ জনবিস্ফোরণ ঘটে চলেছে, মানুষ বাড়ছে হু হু করে, মাথাপিছু যেখানে দশ স্কোয়ার ফিটও বরাদ্দ নেই, সেখানে এরকম একটা জায়গার কথা ভাবা যায় না। এমন একটা বাড়ি পাওয়া সম্ভব হয়েছে অমিতাদির জন্য। তাঁরই জানাশোনা এবং একান্ত গুণগ্রাহী এক ভদ্রমহিলা তাঁর একমাত্র ছেলের কাছে চলে গেছেন। ছেলে আমেরিকায় সিটিজেনশিপ নিয়ে সে দেশেই থেকে গেছে। বিয়েও করেছে ওখানকারই মেয়ে। ভারতবর্ষে ফেরার আর সম্ভাবনা নেই। মাকে বৃদ্ধ বয়সে একা একা দেশে ফেলে রাখতে চায় না। অনেক দিন থেকেই নিজের কাছে নিয়ে যাবার জন্য তাগাদা দিচ্ছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলা চলে যেতে

পারছিলেন না শুধু এই বাড়িটার কারণে। এটা তাঁর শ্বশুরবাড়ি। পনের বছর বয়সে এখানে নতুন বউ হয়ে ঢুকেছিলেন। তারপর পঞ্চান্নটা বছর কেটে গেছে। জীবনের শেষ পর্বে সেটা বেচে দিয়ে দেশের মাটি থেকে শিকড় তুলে নিতে তাঁর মন সায় দেয়নি। তা ছাড়া এমনও হতে পারে হয়ত আমেরিকা তাঁর ভাল লাগল না। আবার ফিরে এলেন দেশে, তখন উঠবেন কোথায়? অমিতাদিকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন, তার চাইতে বিশ্বাস করতেন বেশি। তাই বাড়িটাব দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। অমিতাদি ইচ্ছামত এটা ব্যবহার করতে পারেন। তবে ফিরে এলে বাড়িটা ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি ফেরা না হয়, আমেরিকাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, ছেলে দেশে এসে অমিতাদির সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা করবে। যাই হোক, ফাঁকা বাড়িটা পেয়ে সুবিধা হয়েছে। 'নারী-জাগরণ'-এর অফিস এখানে বসাতে পেরেছেন অমিতাদি। ভবিষ্যতে কী হবে, তখন ভাবা যাবে। আপাতত তাঁদের কাজ তো চলুক।

অফিস বাড়িটায় সবসুদ্ধু সাতখানা ঘর। দুটো ঘর নিয়ে চমৎকার একখানা লাইব্রেরি। অন্য ঘরগুলোতে 'নারী-জাগরণ'-এর নানা ডিপার্টমেন্ট। এইসব ঘরের দেয়াল জুড়ে, উঁচু উঁচু আলমারি। আলমারিগুলো নানারকম ম্যাগাজিন এবং ফাইল-পত্রে ঠাসা। মেয়েদের নিয়ে সারা ভারতে যেখানে যা যা ঘটনা ঘটে চলেছে এবং খবরের কাগজে এ-বিষয়ে যে সব রিপোর্ট বেরুচ্ছে ফাইলগুলোতে তার কাটিং সাজানো রয়েছে। এ-ছাড়া প্রতিটি ঘরেই রয়েছে টেবল চেয়ার টাইপরাইটার ইত্যাদি।

আজ অমিতাদি সবাইকে জরুরি তলব করে যে ডেকে এনেছেন তার কারণ এইরকম। দুদিন আগে বালিগঞ্জের এক দামী, অভিজাত পাড়ায় দাবি অনুযায়ী পণ দিতে না পারায় একটি বউকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। বধূ হত্যার প্রতিবাদে আজ দুটোয় 'নারী-জাগরণ' মিছিল বার করবে। সদস্যরা না এলে মিছিল হবে কী করে?

একসঙ্গে এতজন মেম্বার এসে পড়ায় অফিসে জায়গা হয়নি। বেশির ভাগই বাইরের সবুজ জমিতে বসে আছে। মিছিলে নিয়ে যাবার জন্য কয়েকজন পোস্টারে স্লোগান লিখছে। বাকিরা দুদিন আগের বউ পোড়ানোর ঘটনা নিয়ে তুমুল চেঁচামেচি করছে। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির শেষের দিকে এরকম জঘন্য ঘটনা যে ঘটতে পারে—এর চাইতে লজ্জার কী হতে পারে! এই কলকাতায়, যেখানে একশ-সোয়াশ বছর আগে নারীমুক্তির জন্য আন্দোলন হয়েছে, আজ সেখানেই কিনা পুত্রবধূ পোড়ানো হচ্ছে! ভাবা দরকার সোসাইটি সামনের দিকে কতটা এগিয়েছে, নাকি মধ্যযুগের বর্বরতায় ফিরে যাচ্ছে? এর প্রতিকার এখনই করা দরকার, ইত্যাদি।

অফিসের সামনের বড় ঘরটায় গ্লাস-টপ অর্ধবৃত্তাকার একটি টেবলের

ওধারে বসে ছিলেন 'নারী-জাগরণ'-এর প্রেসিডেন্ট অমিতাদি—অমিতা সরকার। তিনি মুখে মুখে ডিকটেসান দিয়ে যাচ্ছেন।

তাঁর মুখোমুখি টেবলের এধারে বসে মুখ নিচু করে নোট নিয়ে যাচ্ছে একটি মেয়ে—অদিতি।

এ ঘরে আরো কয়েকটি তরুণ তরুণীকেও দেখা যাবে। তাদের কেউ ফাইল ঠিক করে রাখছে, কেউ খবরের কাগজের কোনো দরকারী রিপোর্ট কাঁচি দিয়ে কাটছে, কেউ বা সামনের আলমারি থেকে লাল শালুর ফেস্টুন বার করছে। ফেস্টুনটায় বড় বড় হরফে লেখা আছে—'নারী-জাগরণ'।

অমিতাদি যে ব্যাপারে ডিকটেসন দিচ্ছেন সেটা হল একটা মেমোরেন্ডাম অর্থাৎ স্মারকলিপি। মিছিলটা দক্ষিণ কলকাতা ঘুরে শেষ পর্যন্ত রাইটার্স বিল্ডিংসে যাবে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

এবার অমিতাদির দিকে ভালো করে তাকানো যেতে পারে। তার বয়েস পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন। কাঁচাপাকা চুল ছেলেদের মতো ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা।

বাঙালি মেয়েদের তুলনায় তাঁকে লম্বাই বলা যায়। হাইট পাঁচ ফিট ছয় কি সাত। গায়ের রঙ বাদামী, নাক-মুখ কাটা কাটা, ধারালো চিবুক। চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা, পুরু লেন্সের ওধারে ঝকঝকে তীক্ষ্ণ চোখ। বাঁ হাতে চওড়া স্টীল ব্যান্ডে চৌকো ইলেকট্রনিক ঘড়ি ছাড়া শরীরে গয়না টয়না বলতে কিচ্ছু নেই।

অমিতাদির পরনে পুরুষদের মতো ট্রাউজার্স আর হাতা গোটানো ফুলশার্ট, পায়ে চপ্পল। পুরুষ এবং নারীর কোনোরকম পার্থক্য তিনি মানেন না। এমনকি পোশাকের বেলাতেও না। সমস্ত বিষয়েই চান মেয়েরা পুরুষদের সমকক্ষ হোক, কোথাও কোনো সীমারেখা না থাক। এই যে ট্রাউজার্স শার্ট তিনি পরেন, সেটা খানিকটা জেদের কারণেই।

তাঁর হাতে এই মুহূর্তে রয়েছে একটি জ্বলন্ত সিগারেট। সামনের অ্যাশট্রেটা পোড়া সিগারেটের টুকরোয় প্রায় বোঝাই। অমিতাদি চেন স্মোকার। তাঁর হাতে সিগারেট নেই, এমন দৃশ্য আদৌ চোখে পড়ে না। ধূমপান যে তিনি খুব একটা পছন্দ করেন তা নয়। এর পেছনেও সেই একই জেদ।

তিনি ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি পড়ান। পুরু চশমা, শার্ট-ট্রাউজার্স, সিগারেট, মাথায় বয়-কাট চুল—সব মিলিয়ে অমিতাদিকে ঘিরে রয়েছে প্রচণ্ড এক ব্যক্তিত্ব।

অমিতাদির জীবনের গ্রাফটি বিচিত্র। সেখানে প্রচুর বাঁক এবং উত্থান-পতন। সতের বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। পৈতৃক পদবী সরকার পালটে তিনি হয়েছিলেন অমিতা দত্ত। কিন্তু সেই বিয়েটা তিন বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি।

যে ফ্যামিলিতে তিনি বধূ হয়ে যান সেটা ছিল বেজায় গোঁড়া, প্রচণ্ড রক্ষণশীল এবং তেমনি তাদের শুচিবাই। উত্তর কলকাতায় যেটা তাঁর শ্বশুর-বাড়ি সেটা মুঘল হারেমের চাইতেও দুর্ভেদ্য। ছোট ছোট জানলার একদিকে থাকত তারের জাল, আরেক দিকে মোটা পর্দা। যেদিকে তাকানো যাক, দরজায় জানালায় শুধু পর্দা আর পর্দা।

বাড়ি থেকে এক-পা বেরুবার উপায় ছিল না, এমনকি বাপের বাড়িতেও পুজোয় আর জামাইষষ্ঠীতে, এই দুবারের বেশি যেতে দেওয়া হত না। একা স্বামীর সঙ্গে বেরুনো নিষিদ্ধ। সিনেমা থিয়েটারে যেতে হলে পাহারা-দার হিসেবে যেত শাশুড়ি কি খুড়িশাশুড়ি কিংবা বিধবা বড় ননদ। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অমিতাদিকে বাড়িঘর বা আসবাবের মতো একটা পারিবারিক সম্পত্তি মনে করতেন। তাঁর আলাদা যে এক অস্তিত্ব আছে, এটা কেউ ভাবতেও চাইতেন না।

অসূর্যম্পশ্যা বলে যে শব্দটা অভিধানে রয়েছে সেটা একালে তাঁর শ্বশুর-বাড়ির মহিলাদের সম্বন্ধেই বুঝিবা একমাত্র খাটে।

তিন বছর সেই দুর্গে আটকে থেকে যখন অমিতাদির দম বন্ধ হয়ে আসছে সেই সময় একদিন মরীয়া হয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে-ছিলেন। আর কোনোদিন স্বামীর কাছে ফিরে যাননি। আশ্চর্য, স্বামী বা শ্বশুর তাঁর খোঁজ খবর করতে আসেননি। শেষ পর্যন্ত বাবা ডিভোর্সের জন্য আপীল করেন। কিন্তু এবারও স্বামী বা শ্বশুরকে কোর্টে দেখা যায়নি। একতরফা মামলা চালিয়ে জিতে যান অমিতাদিরা এবং মসৃণভাবে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে যায়। আসলে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আর বিনা অনুমতিতে যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে নেবার মতো বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করেননি শ্বশুরবাড়ির লোকেরা।

এরপর অমিতাদির বাবা আবার তাঁর বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজী হননি। প্রথম বিয়ের আগে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। নতুন করে দ্বিতীয় বার ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে সোজা কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, বাবা চিরকাল থাকবেন না, বাবার কিছু ঘটলে কে তাঁকে আশ্রয় দেবে? কোথায় পাবেন নিরাপত্তা? পরের মুখাপেক্ষী না হয়ে বেঁচে থাকতে হলে তাঁর প্রয়োজন সম্মানজনক কোনো চাকরি-বাকরি। নিজস্ব রোজগারের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সামান্য একজন ম্যাট্রিকুলেটকে কে কাজ দেবে।

চার বছর কলেজে এবং দু বছর ইউনিভার্সিটিতে, মোট ছটা বছর চোখের পলকে যেন কেটে গিয়েছিল। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েই অমিতাদি কলেজে লেকচারারশিপ পেয়ে যান। সেখানে বছর সাতেক পড়াবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়ে চলে আসেন। এই সময় তাঁর জীবনে আসে

আরেকটি পুরুষ—বিমলেশ।

বিমলেশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে অমিতাদির বিয়ে হয়নি। স্বামী-স্ত্রীর মতো তাঁরা একসঙ্গে কিছুদিন কাটিয়েছেন কিন্তু সম্পর্কটা একেবারেই স্থায়ী হয়নি। কেননা তখন তিনি জানতেন না বিমলেশ বেজায় অলস এবং প্রচণ্ড মাতাল। পাকস্থলীতে হুইস্কিটা বেশি পরিমাণে ঢুকে গেলে সে ভায়োলেন্ট হয়ে উঠত। তার ওপর একসঙ্গে মাস তিনেক কাটাবার পর সে দুম করে চাকরি ছেড়ে দেয় এবং অমিতাদির কাঁধে চড়ে বসে। তার ধারণা ছিল চিরকাল অমিতাদি তাকে পুষবেন আর মদের পয়সা যোগাবেন। অতিষ্ঠ অমিতাদি একদিন তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেন। সেই থেকে পুরুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণা আগাগোড়া পালটে যায়। বিশেষ করে বিবাহিত এবং অবিবাহিত দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে তাঁর কোনোরকম মোহ বা আকর্ষণ থাকে না। এ ব্যাপারে তাঁর পুরোপুরি স্বপ্নভঙ্গ ঘটে।

আজকাল অমিতাদি যে অনবরত সিগারেট খান, শার্ট ট্রাউজার্স পরেন—এ সবই এক ধরনের প্রোটেস্ট। পুরুষশাসিত সোসাইটিকে তিনি একরকম ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন। 'নারী জাগরণ'-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি পুরুষের প্রভুত্ব, স্বার্থপরতা আর নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধই ঘোষণা করেছেন বলা যায়।

অমিতাদি প্রেসিডেন্ট হলেও টেবলের ওধারে বসে যে মেয়েটি (অর্থাৎ অদিতি) ডিকটেসন নিচ্ছে সে-ই এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র।

অদিতি 'নারী-জাগরণ'-এর একজন অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী। তার বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ। গায়ের রং ডিমের ভেতরকার কুসুমের মতো। টান টান সতেজ চেহারা। লম্বাটে মুখ, নাক সটান কপাল থেকে নেমে এসেছে। উজ্জ্বল চোখ তার, রাজহাঁসের মতো গলা, নিটোল হাতে কোথাও এতটুকু ভাঁজ নেই। দীর্ঘ ঘন চুল এলোমেলোভাবে একটি খোঁপায় আটকানো।

পরনে হালকা রঙের তাঁতের শাড়ি এবং হলুদ ব্লাউজ। অমিতাদির মতোই তার হাতে একটি ঘড়ি ছাড়া আর কোনো গয়না-টয়না নেই। এতেই তাকে অলৌকিক মনে হয়। তার চেহারায় আভিজাত্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব মিশে আছে।

অদিতি একটা কলেজে ইংরেজি পড়ায়। এমন এক পরিবার থেকে সে এসেছে যার ইতিহাস রীতিমত জটিল। কিন্তু সে কথা এখন না, পরে বিস্তৃতভাবে বলতে হবে।

একসময় ডিকটেসন নেওয়া শেষ হয়।

অমিতাদি বলেন, 'কৃষ্ণাকে মেমোরেন্ডামটা টাইপ করতে দাও। খুব তাড়াতাড়ি যেন করে দেয়। দশ মিনিটের ভেতর আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।'

অদিতি একটি মেয়েকে ডেকে স্মারকলিপির খসড়াটা তার হাতে দেয়। সে পাশের ঘরে টাইপ করতে চলে যায়।

অমিতাদি এবার অন্য একটি মেয়েকে বলেন, 'ইন্দ্রাণী তুমি বাইরে গিয়ে একটু দেখ তো, ওদের পোস্টার লেখা হয়ে গেছে কিনা।'

একটি তেইশ চব্বিশ বছরের তরুণী ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে খবর দেয় পোস্টার লেখা শেষ করে সবাই অপেক্ষা করছে।

কৃষ্ণার টাইপ হয়ে গিয়েছিল। সে মিনিট দশেক পরে 'নারী-জাগরণ'-এর একটা খাম এবং মেমোরেন্ডামটা নিয়ে এসে অমিতাদির হাতে দেয়। অমিতাদি দ্রুত একবার টাইপ-করা কাগজটা দেখে, খামে পুরে মুখটা বন্ধ করে দেন। তারপর বলেন, 'অদিতি, কৃষ্ণা—ওঠা যাক! অনেকটা রাস্তা আমাদের যেতে হবে। একজন গিয়ে দারোয়ানকে বল, সে যেন অফিস বন্ধ করে দেয়।'

'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে একজন দারোয়ান এবং দুটি বেয়ারা রয়েছে। কম্পাউন্ডের পেছন দিকে যে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স আছে, তারা সেখানে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অদিতি বলল, 'আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে মিছিলে যাচ্ছি না অমিতাদি।'

অমিতাদি রীতিমত অবাকই হন। বলেন, 'কেন?'

'আজ ঢাকুরিয়ার বস্তিতে যাবার প্রোগ্রাম আগে থেকেই ঠিক করা আছে। ওখানে খবরও পাঠানো হয়েছে। বস্তিতে মেয়েরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

আপাতত 'নারী-জাগরণ'-এর একটা বড় কাজ হল, কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে সেখানকার মেয়েদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করা। অর্থনৈতিক সামাজিক এবং পারিবারিক দিক থেকে তারা কোন লেভেলে পড়ে আছে সে ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর সংগ্রহ করে মোটা মোটা ফাইল তৈরি করা হচ্ছে। পরে এদের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় তার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। বস্তিবাসী মেয়েদের সমস্যা এতই জটিল, বিশাল এবং সুদূরপ্রসারী যে 'নারী-জাগরণ'-এর মতো একটি ছোট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কিছুই প্রায় করা সম্ভব নয়। এ জন্য সরকারী আর বে-সরকারী সাহায্য একান্ত জরুরী।

'নারী-জাগরণ'-এর তরফ থেকে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আর মিনিস্ট্রির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। অমিতাদি অদিতি এবং আরো কয়েকজন চারটি চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করেছেন। সব জায়গাতেই ভাল সাড়া পাওয়া গেছে। সকলেই অসহায় মেয়েদের সম্পর্কে সহানুভূতি জানিয়ে বলেছেন, সঠিক প্রস্তাব পাওয়া গেলে তাঁরা অবশ্যই সাহায্য করবেন।

অমিতাদির কিছু মনে পড়ে যায়। তিনি বলেন, 'বউ পোড়ানোর এই ঘটনাটা নিয়ে এতই ডিসটার্বড হয়ে ছিলাম যে ঢাকুরিয়ার প্রোগ্রামটার কথা মনে ছিল না। ঠিক আছে, তুমিই যাও। তোমার সঙ্গে আর কে কে যাবে ?'

ঘরের এক কোণে একটি ঝকঝকে চেহারার যুবক বই থেকে কিছু নোট করছিল। সে মুখ তুলে বলে, 'আমি অদিতির সঙ্গে যাচ্ছি।'

অমিতাদি হেসে বললেন, 'জানি বিকাশ। অদিতি যেখানে যাবে তুমিও সঙ্গে থাকবে।' তাঁর হাসিতে প্রশ্রয় এবং মজা দুই-ই রয়েছে।

বিকাশ বিব্রত মুখে বলে, 'না, মানে—'

অমিতাদি এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'দুজনে তো হবে না। তোমাদের সঙ্গে কৃষ্ণা, রমেন আর এষা যাক।' বলেই গলা তুলে ডাকতে লাগলেন, 'রমেন এষা, ঘরে এসো—'

পাশের ঘর থেকে রমেন এবং এষা এ ঘরে চলে আসে। দুজনেরই বয়েস তিরিশের নিচে।

রমেন একটা ব্যাঙ্কে জুনিয়র গ্রেডের অফিসার। গোলগাল ভালমানুষ চেহারা। এই মুহূর্তে তার পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি।

এষা ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে উঁচু ক্লাশে ফিজিক্স পড়ায়। পোশাকের ব্যাপারে সে বেপরোয়া। তার পরনে জীনস এবং টী-শার্ট, পায়ে পুরুষদের চপ্পল। চুলে বয়-কাট। পোশাকে এবং চালচলনে অমিতাদির মতোই পুরুষদের সঙ্গে কোনোরকম পার্থক্যই সে রাখতে চায় না। দারুণ স্মার্ট আর ঝকঝকে চেহারা। অমিতাদির মতো চেন স্মোকার না হলেও সিগারেটটা একটু বেশিই খায়। অবশ্য এই মুহূর্তে তার হাতে সিগারেট নেই।

অমিতাদি এষা এবং রমেনকে বললেন. 'আজ ঢাকুরিয়া বস্তিতে আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে। অদিতি আর বিকাশের সঙ্গে তোমাদের দুজনকে সেখানে যেতে হবে।'

দুজনেই জানায়, বস্তিতে যেতে তাদের আপত্তি নেই।

অদিতি এষাকে লক্ষ করতে করতে হঠাৎ বলে ওঠে, 'এষা না গেলেই ভাল হয়।'

অমিতাদি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন ?'

অদিতি যা উত্তর দেয় তা এইরকম। তারা যেখানে যাচ্ছে, এষার মতো পুরুষালি পোষাক এবং চুলের ছাঁট সেখানে একেবারেই খাপ খায় না। বস্তির মেয়েরা এতে আদৌ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে না। শামুকের মতো নিজেদের গুটিয়ে রাখবে। তারা যদি সহজভাবে কাছে এগিয়ে না আসে, তাদের সমস্যার কথা জানা যাবে কী করে ?

এষা বিরক্ত হচ্ছিল। সে কিছুটা তীক্ষ্ম গলায় বলে, 'ওরা শুধু আমার চুলের কাট আর জীনস-টিনস নিয়েই মাথা ঘামাবে ? ওদের সম্পর্কে আমার

সিমপ্যাথি আর সিনসিয়ারিটির কথা ভাববে না?'

অদিতি কোনো কারণেই সহজে উত্তেজিত হয় না। শান্ত মুখে বলে, 'বস্তি নিয়ে আমি বছরখানেক কাজ করছি। ওখানকার মেয়েদের সাইকোলজি খানিকটা বুঝি। এমনভাবে ওখানে যাওয়া উচিত যাতে ওরা মনে করে আমরা ওদেরই লোক। না হলে কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

এষা ঝাঁঝালো মুখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেন অমিতাদি। অদিতি কি বলতে চেয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয়নি তাঁর। বলেন, 'ঠিক আছে, এষা আমাদের সঙ্গে চলুক। চিফ মিনিস্টারের হাতে মেমোরেন্ডামটা ও-ই দেবে। অদিতি, তুমি যাকে সুটেবল মনে কর, নিয়ে যাও।'

মিনিট পনেরো পর অমিতাদি বিরাট মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। সামনের দিকে লাল শালুর ফেস্টুনের দুই প্রান্ত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে দুজন মাঝবয়সী মহিলা সদস্য।

পাশাপাশি দুটি লাইন করে রাস্তার বাঁ ধার ঘেঁষে মিছিলটা চলছে। অনেকের হাতেই পোস্টার। সেগুলোতে নারী-স্বাধীনতা, নারী-নির্যাতন ইত্যাদি নানা বিষয়ে বড় বড় হরফে অনেক কথা লেখা আছে। দুই লাইনের মাঝখানে অনিমেষ আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে স্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছে। কণ্ঠস্বরে নানারকম উত্থান-পতন ঘটিয়ে স্লোগানটা সে চমৎকার দিতে পারে। তার কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে গোটা মিছিলটা গলা মিলিয়ে চিৎকার করে উঠছে।

'পণপ্রথা—'

'বন্ধ কর, বন্ধ কর।'

'বধূ হত্যা—'

'চলবে না, চলবে না।'

'বধূ হত্যাকারীদের—'

'শাস্তি চাই, শাস্তি চাই।'

'নারীর মর্যাদা—'

'রক্ষা করুন রক্ষা করুন।'

স্লোগান দিতে দিতে মিছিল গোল পার্কের দিকে এগিয়ে যায়। এদিকে অদিতিও বেরিয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে রয়েছে বিকাশ রমেন এবং অন্য একটি মেয়ে—বিশাখা। ওরাও ফেস্টুন এবং তিন চারটে পোস্টার একটা বড় প্যাকেটে করে নিয়ে এসেছে। আর এনেছে নোটবুক, ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদি।

'নারী-জাগরণ'-এর অফিস থেকে ঢাকুরিয়ার বস্তি দু-আড়াই কিলোমিটার

দূরে। ওরা খানিকটা বাসে, খানিকটা হেঁটে যখন সেখানে পৌঁছুল, বিকেল হয়ে গেছে।

দুই

ঢাকুরিয়ার এই বস্তি প্রায় মাইলখানেক জায়গা জুড়ে। ভাঙাচোরা টালি বা ফুটিফাটা টিনের চালার লাইন এঁকেবেঁকে নানা দিকে চলে গেছে। প্রতিটি চালায় একটি করে ফ্যামিলি থাকে। মুখোমুখি দুই লাইনের মাঝখানে স্যাঁতসেঁতে সরু গলি। সেগুলো একই সঙ্গে পায়ে চলার পথ এবং নর্দমা। দুধারের ঘরগুলো থেকে থুতু, কফ, মাছের আঁশ, ইত্যাদি যাবতীয় আবর্জনা ওখানে ছুঁড়ে ফেলা হয়। এখানে ওখানে বাচ্চাদের প্রাকৃত কর্মের কিছু চিহ্নও আকছার চোখে পড়বে। এখানকার বাতাসে একটা ঘন চাপ-বাঁধা দুর্গন্ধ সারাক্ষণ অনড় হয়ে থাকে।

বস্তির বাসিন্দাদের বেশির ভাগই বাঙালি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আর সুন্দরবন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ভূমিহীন চাষী কাজকর্ম না পেয়ে এই বস্তিতে এসে উঠেছে। কলকাতায় এলে রোজগারের একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, এই ভরসায়। যাদের সামান্য জমিজমা ছিল, ঋণের দায়ে সেসব খুইয়ে তাদের অনেকেই চলে এসেছে। আব এসেছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িষা, মধ্যপ্রদেশ আর অন্ধ্রের গরীব হাভাতে কিছু মানুষ। এদের সবারই বিশ্বাস, কলকাতা কাউকে ফেরায় না। কোনো না কোনো ভাবে পেটের দানার ব্যবস্থা করে দেয়।

এখানকার পুরুষ মানুষেরা অনেকেই সাইকেল-রিকশা চালায়, কেউ ঠেলাওলা, কেউ গ্যারেজে বাস-লরীর ক্লিনার, কেউ হকার, কেউ চোর, কেউ বে-আইনি চোলাই বানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বিক্রি করে। এইভাবে নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করে তারা পেট চালায়।

বস্তিটার ডান দিকে ঝকঝকে চওড়া একটা রাস্তার ওপারে পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদের বিশাল হাউসিং কমপ্লেক্স। সেখানে রয়েছে হাজার দেড় দুই নানা টাইপের ফ্ল্যাট। হাউসিং কমপ্লেক্সটার বাঁ দিকে সাউথ ক্যালকাটার পশ লোকালিটি। ওখানে নিও রিচ বা নতুন বড়লোকদের একটা পাড়া স্বাধীনতার পর গজিয়ে উঠেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত আর্কিটেকচারের দারুণ দারুণ সব বাড়ি। কিছু মানুষের হাতে কী পরিমাণ টাকা জমেছে, এখানে এলে টের পাওয়া যায়। বস্তি এবং বড়লোকদের পাড়ার মাঝখানে বাউন্ডারি লাইন হল সেই ঝকমকে অ্যাসফাল্টের রাস্তাটা।

বস্তির পুরুষদের একার রোজগারে সংসার চলে না। তাই মেয়েদেরও হাউসিং কমপ্লেক্সে আর পশ পাড়ায় কাজে বেরুতে হয়। বস্তিটা মেইড সারভেন্ট সাপ্লাইয়ের প্রকাণ্ড একটা আড়ত।

বস্তিটার ঠিক মুখেই পাশাপাশি দুটো জলের কল এবং একটা ল্যাম্প-পোস্ট। বছর তিনেক আগে নির্বাচনের সময় কর্পোরেশন থেকে এখানে রাস্তার আলো এবং জলের ব্যবস্থা করা হয়; এই বস্তিবাসীরা সবাই স্কোয়াটার্স, সরকারী খাস জমিতে জবরদখল বসে গেছে। ভোট পেতে হলে একটু কিছু তো করতেই হয়। তাই রেশন কার্ড বিতরণ করে কলকাতা মেট্রোপলিসের বৈধ নাগরিক করে নেওয়া হয়েছে তাদের।

জলের কল এবং ল্যাম্পপোস্টের ধার ঘেঁষে একটা নিচু টালির চালার তলায় চায়ের দোকান। দোকানটার সামনে দু'তিনটে নড়বড়ে বেঞ্চ পাতা। সেখানে আট-দশটা লোক চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে বসে আছে।

ভেতরে উঁচু তক্তাপোষে মধ্যবয়সী পেটানো চেহারার একটি লোককে দেখা যাচ্ছে। তার সামনে ছোট টিনের ক্যাশবাক্স এবং অনেকগুলো কাচের বোয়েম সাজানো রয়েছে। সেগুলোতে আছে সস্তা বিস্কুট, লজেন্স, মোয়া, বাদাম, হজমীগুলি ইত্যাদি। বাঁ পাশে খোলা কাঠের র‍্যাকে রয়েছে গাদা গাদা বিড়ির বাণ্ডিল, সিগারেটের খোলা প্যাকেট, মোমবাতির বাক্স, চিড়ে-মুড়ি এবং বাজে বেকারির পাউরুটি।

দোকানটার এক কোণে প্রকাণ্ড উনুন জ্বলছে। সেটার পাশে বসে আছে বয়স্কা একটি মেয়েমানুষ। তার কপালে এবং সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর। সামনে একটা সিলভারের বড় পরাতে অনেকগুলো খালি চায়ের গেলাস, ডিস-টিশ রয়েছে। পাশেই সারি সারি জলের বালতি। একটি কমবয়েসী মেয়ে সেখানে এঁটো গেলাস-টেলাস ধুচ্ছে।

মধ্যবয়সী লোকটার নাম যুধিষ্ঠির, এই চায়ের দোকানটা তার। বয়স্কা মেয়েমানুষটি তারই স্ত্রী। গেলাস যে ধুচ্ছে সে তার মেয়ে।

রাস্তার একটা বাঁক ঘুরে অদিতিরা চায়ের দোকানের সামনে চলে আসে। যুধিষ্ঠির তাদের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল। তক্তাপোষ থেকে নেমে একরকম দৌড়েই বাইরে বেরিয়ে এল সে। উৎসুক মুখে বলে, 'এসেচেন দাদাবাবুরা, দিদিমণিরা—আসুন, আসুন—' বলে নিজেই টানা-হ্যাঁচড়া করে চায়ের দোকানের একটা বেঞ্চ, একটা পুরনো চেয়ার এবং উঁচু প্যাকিং বাক্স বার করে আনে, 'বসুন, বসুন—'

এর আগেও বার চারেক এই বস্তিতে মেয়েদের সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করতে এসেছে অদিতিরা। প্রথম দুবার বিশেষ কিছুই হয়নি। হুট করে এসে তারা মেয়েদের ডেকে ডেকে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছিল। এতে সবাই ভয়ানক ঘাবড়ে যায়। অদিতিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে যে কেউ মুখ খোলেনি। এরা যদি কিছুই না বলে এখানে আসার মানে হয় না। যে বিপুল সমস্যার কেন্দ্রে তারা যেতে চায়, এরা না জানালে সেদিকে এক পা-ও এগুনো যাবে না।

দুবার ফিরে যাবার পর তৃতীয় দিন এসে অদিতিরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভাল করে আলাপ জমিয়ে নেয়। তারা আগেই খবর পেয়েছিল যুধিষ্ঠির এই বস্তির একজন নেতা গোছের লোক। তার কথা মোটামুটি সবাই মেনে চলে। এখানে তার প্রচণ্ড দাপট। বস্তিতে তার মুখের কথাই আইন। ছোট ছোট ঝগড়াঝাঁটি সে-ই মিটিয়ে দেয়. তার সঙ্গে পরামর্শ করে সবাই ভোট দিয়ে আসে। তবে ব্যতিক্রমও কিছু কিছু রয়েছে, এরা মুখ ফুটে না বললেও তার মাতব্বরিতে খুশি নয়। তবে এটা ঠিক, যুধিষ্ঠির বস্তির লোকজনের সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী, সকলের বিপদে-আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

স্থানীয় কারো সহযোগিতা না পেলে বস্তিতে আসা-যাওয়া সার হবে। বাইরে থেকে উটকো লোক এলে সন্দেহের চোখেই দেখার কথা। বস্তির অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরা বিশ্বাসই করতে চাইবে না, নিতান্ত অকারণে, বিনা উদ্দেশ্যে অদিতিরা তাদের উপকার করতে এসেছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ কেউ তাড়াতে পারে, এটা এখানকার বাসিন্দাদের কাছে ঘোর সংশয়ের ব্যাপার। তাই অদিতিরা গোপনে যুধিষ্ঠিরকে কিছু টাকা দিয়ে জানিয়েছিল, তাদের সাহায্য করলে আরো প্রাপ্তির আশা আছে। কিছু না পেলে অকারণে পরোপকার করতে কে-ই বা চায় ?

কাজেই অদিতিদের ব্যাপারে উৎসাহ বেড়ে গেছে যুধিষ্ঠিরের। অদিতিরা কবে আসবে, আগে থেকে জানিয়ে যায়। সেদিন বিকেল হতে না হতেই সে তাদের জন্য অস্থির হয়ে থাকে।

বলামাত্রই বসে না অদিতিরা। প্রথমে লাল শালুর ফেস্টুনে টাঙিয়ে দেয়। পোস্টারগুলোর সঙ্গে কাঠের খুঁটি আটকানো রয়েছে, সেগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলে। পোস্টারগুলোতে লেখা রয়েছে, নারী নির্যাতন বন্ধ কর, নারীকে সম্মান দিতে হবে, নারীর স্বাধীনতা চাই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

যুধিষ্ঠির হইচই বাধিয়ে স্ত্রীকে দিয়ে চার কাপ 'ইস্পেশাল চা' বানিয়ে আনে। প্লেটে আটখানা নোনতা বিস্কুট নিয়ে আসে তার মেয়েটা। সসম্ভ্রমে বলে, 'দাদাবাবু দিদিমণিরা, কাজ শুরুর আগে একটুস চা খেয়ে ল্যান —'

অদিতি লক্ষ করেছে, টাকা পয়সা পাওয়ার পর থেকে যুধিষ্ঠিরের খাতিরের মাত্রাটা আচমকা বেড়ে গেছে। চা না খেলে রেহাই নেই। বাজে সময় নষ্ট না করে অদিতিরা চা-বিস্কুট নেয়। খেতে খেতে বলে, 'যুধিষ্ঠিরদা, দেরি করতে পারব না। আমরা এখনই কাজ শুরু করতে চাই।'

যুধিষ্ঠির জানে, এবার তাকে কী করতে হবে। বস্তির মেয়েদের একজন একজন করে নিয়ে আসবে সে। ঠিক করা আছে, রোজ পঁচিশ তিরিশ জন মেয়ের ইন্টারভিউ টেপ করা হবে এবং ক্যামেরায় তাদের ছবি তোলা হবে। যুধিষ্ঠির বলল, 'ঠিক আছে, আমি পাঁচ মিনিটের ভেতর একজনকে হাজির

করে দিচ্ছি।' বলে আর দাঁড়ায় না, লম্বা লম্বা পা ফেলে বস্তির ভেতর ঢুকে যায়।

ভোটারদের লিস্ট দেখে অদিতিরা আগেই জেনে গিয়েছে, এই বস্তিতে সবসুদ্ধু তিন হাজার দু'শ বাইশ জন অ্যাডাল্ট মেয়েমানুষ রয়েছে। একদিনে তিরিশ বত্রিশ জনের সঙ্গে কথাবার্তা বললে অন্তত এক শ বার তাদের এখানে আসতে হবে।

প্রথম দুদিন কোনো কাজ হয়নি। তার পরের দুদিনে চল্লিশ জনের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। নতুন জায়গায় শুরু করতে হয়েছে বলে প্রথম প্রথম বেশি মেয়ের সঙ্গে কথা বলা যায়নি। তাদের আড়ষ্টতা এবং সন্দেহ ঘোচাতে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হয়েছে। তবে আজ থেকে সংখ্যাটা বাড়াতেই হবে।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অদিতি বিকাশদের বলে, 'এবার রেডি হয়ে নাও। যুধিষ্ঠিরদা এখনই ফিরে আসবে।' বলতে বলতে একমাত্র চেয়ারটায় বসে পড়ে।

বিকাশ বলে, 'আমরা রেডি।'

চেয়ারের সামনে উঁচু প্যাকিং বক্স। ওটা টেবলের কাজ করবে। প্যাকিং বক্সের পর নড়বড়ে বেঞ্চটায় ভাগাভাগি করে বাকি তিন জন বসে পড়ে। তারপর ব্যাগ থেকে ক্যামেরা, নোটবুক এবং টেপ রেকর্ডার সাজিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

অদিতিরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে বিশ বাইশ ফিট দূরত্বে কর্পোরেশনের কল দুটোতে এখন বিকেলের জল এসে গেছে। ওখানে বিরাট লাইন। দেড়শ দু'শ পুরুষ এবং মেয়েমানুষ বালতি হাঁড়ি ডেকচি পর পর বসিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য সময় হলে লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে এতক্ষণ তুলকালাম হয়ে যেত কিন্তু এখন কারো জলের দিকে নজর নেই, অপার কৌতূহল এবং বিস্ময় নিয়ে তারা অদিতিদের লক্ষ করছে। এর আগেও তো বার কয়েক অদিতিরা এখানে এসেছে, তবু তাদের সম্বন্ধে বস্তিবাসীদের অসীম ঔৎসুক্য।

যারা লাইন দেয়নি, এমন কিছু লোকজন একধারে দাঁড়িয়ে অদিতিদের দেখতে দেখতে জটলা করছিল। ফিসফিসিয়ে তারা এভাবে বলাবলি করছে।

একজন বলে, 'এই দাদাবাবু দিদিমণিরা দু-চারদিন, পর পর কী জন্যি আসে?'

'নারী-স্বাধীনতার জন্যি। ওই তো লেখা আছে, নারী-নির্য্যাতন বন্ধ কর। নারীর মুক্তি চাই।' বলে কিছুটা লেখাপড়া জানা একটি লোক আঙুল বাড়িয়ে একটা পোস্টার দেখিয়ে দেয়।

'ব্যাপারটা একটুস বুঝিয়ে বল দিকিন—'

'ওই যে আমরা ঘরের মেয়েমানুষদের ঠ্যাঙাই, সেটা বোধহয় এনারা বন্ধ করতে চায়।'

'হাই ভগমান, মেয়েমানুষকে না ঠ্যাঙালে কি বশে থাকে? মুঠো থেকে বেরিয়ে যাবে না?'

'যা বলেচ। বড়লোকের ছেলেমেয়েদের তো কাজ নেই। মাথায় পোকা নড়ে উঠল, অমনি বস্তির মেয়েমানুষদের জন্যি দরদ উথলে উটেচে।'

'নেই কাজ তো খই ভাজ।'

অদিতিদের ঘিরে এই মুহূর্তে বস্তির শখানেক ন্যাংটো আধা-ন্যাংটো কাচ্চাবাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে, চোখ গোল করে তাদের লক্ষ করছে। এদের বয়স তিন থেকে পাঁচের ভেতর। ইণ্ডিয়াতে পপুলেশন এক্সপ্লোসান কী ধরনের হয়েছে তার কিঞ্চিৎ নমুনা ঢাকুরিয়ার এই বস্তিতে এলে টের পাওয়া যায়।

যদিও অদিতি চূড়ান্ত আশাবাদী এবং তার মধ্যে অদম্য জেদ রয়েছে তবু চারপাশের এই অস্বস্তিকর পরিবেশে বসে নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে কতটা কী করতে পারবে, ভাবতেই খানিকটা হতাশা বোধ করে। পরক্ষণেই সব নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলে নিজেকে সজীব করে তোলে। এর মধ্যেই তাকে কাজ করতে হবে।

অদিতি বিকাশদের কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দেখা যায় যুধিষ্ঠির বস্তির ভেতর থেকে একটি অবাঙালি মেয়েমানুষকে সঙ্গে করে তাদের কাছে চলে এসেছে।

যুধিষ্ঠির অদিতিকে বলল, 'দিদিমণি, লছমীকে নিয়ে এলাম। এখন একে দিয়েই শুরু করুন। পরে অন্যদের ডেকে আনচি।' অদিতিকে বলার কারণ আছে। কদিন লক্ষ করে যুধিষ্ঠির টের পেয়েছে, এই ছোট টীমটার সে-ই নেত্রী।

অদিতি বেশ সমাদর করে লছমীকে বলে, 'বসুন দিদি, বসুন—'

বিকাশরা সরে গিয়ে অনেকটা জায়গা করে দেয়। লছমী জড়সড় হয়ে বেঞ্চের একধারে অদিতির মুখোমুখি বসে পড়ে।

লছমীর বয়স বোঝার উপায় নেই। তবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়। শক্ত গড়নের চেহারা তার, হাত পায়ের হাড় মোটা মোটা। গাল খানিকটা ভেঙেছে, হনু দুটো উঁচু। গায়ের চামড়ায় যৌবনের উজ্জ্বলতা নেই, পেন্সিলের অস্পষ্ট টানের মতো সরু সরু দাগ পড়তে শুরু করেছে। চোখের কোলে হালকা কালির ছোপ। তবু তার মধ্যে লাবণ্যের সামান্য একটু তলানি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে।

মুখটি সারল্যে মাখানো। ঘোমটাটা কপালের আধাআধি নেমে এসেছে। দুই ভুরুর মাঝামাঝি এবং হাতের পাতার পেছন দিকে অনেকগুলো উল্কি—

তার কোনোটা পদ্ম, কোনোটা শঙ্খ, কোনোটা হরিণ বা পাখি। পরনে বিহার বা উত্তরপ্রদেশের দেহাতী ঢংয়ে রঙিন শাড়ি। হাতে রুপোর কাংনা, আঙুলে চাঁদির আংটি।

যদিও লাজুক, লছমীর চোখেমুখে কৌতুকের একটি হাসি যেন আটকে আছে।

চোখের ইশারায় বিকাশকে টেপ রেকর্ডার চালাতে বলে অদিতি সোজা লছমীর দিকে তাকায়, 'দিদি, আপনি বাংলা জানেন তো?'

লছমী মৃদু গলায় বলে, 'জরুর। দশ বরষ কলকাত্তা শহরে কেটে গেল। আর বাংলা বুলি জানব না?'

'আপনাকে পনের বিশ মিনিট একটু কষ্ট দেব। আমরা কটা কথা জানতে চাই। যদি দয়া করে বলেন—'

'হাঁ হাঁ, পুছ করুন না।'

অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'আপনার নাম?'

'লছমী দুসাধ।'

'স্বামীর নাম?'

গালের পাশে ঘোমটা টেনে দ্রুত অন্য দিকে মুখ ফেরায় লছমী। বলে, 'শরমকি বাত। মরদের নাম কেউ মুখে আনে!'

ওধার থেকে যুধিষ্ঠির বলে ওঠে, 'বদরী দুসাধ।'

এদিকে লছমির ইন্টারভিউ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের লোকজন অদিতির দিকে এগিয়ে এসেছে। লছমীকে এমন অনেক প্রশ্ন করতে হবে, এত লোকজনের সঙ্গে সে সবের উত্তর দেওয়া প্রায় অসম্ভব। অদিতি যুধিষ্ঠিরকে ডেকে কানে নিচু গলায় বলে, 'এরকম ভিড় হলে তো আমাদের পক্ষে কাজ করাই যাবে না। ওদের চলে যেতে বলুন যুধিষ্ঠিরদা—'

আগের দুদিনও লোকজন সরিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেছে অদিতি। মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের ভেতর থেকে একজন জবরদস্ত নেতা বেরিয়ে আসে। সে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দাপটের গলায় বলে, 'এই তোমরা এখেনে কী করচ? সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে যে যার কাজে যাও। একদম ঝামেলা করবেনি।'

লোকগুলো বস্তির দিকে অনেকটা পিছু হটে। তবে একেবারে চলে যায় না। দূর থেকেই অদিতিদের লক্ষ করতে থাকে। খানিকটা অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, পঞ্চাশ গজ তফাত থেকে ওরা কেউ তাদের কথা শুনতে পাবে না। অবশ্য প্রশ্নোত্তরটা নিচু গলাতেই করতে হবে।

অদিতি এবার যুধিষ্ঠির, বিকাশ এবং রমেনকে চায়ের দোকানে গিয়ে বসতে বলে। কেননা তার প্রশ্নের উত্তরে এমন সব তথ্য লছমীকে জানাতে হবে যা স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সামনে মুখে আনা যায় না।

ব্যাটারি সেটের টেপ রেকর্ডার চালু করাই ছিল। অদিতি জিজ্ঞাসা করে,

'আপনার স্বামী কি কাজ করেন?'

লছমী বলে. 'রিশকা গাড়ি চালায়।'

'নিজের রিকশা?'

'নহী দিদিজি। রিশকা কেনার পাইসা কোথায়? মালিকের কাছ থেকে ভাড়া করে এনে দিনভর খাটায়।'

'মাসে কিরকম আয় হয়?'

'মালিককে গাড়িয়ার জন্যে রোজ পাঁচ রুপাইয়া দিতে হয়। সে সব দিয়ে দু থেকে ঢাই শ (আড়াই শ) রুপাইয়া থাকে।'

'আপনি কিছু করেন?'

'হাঁ। পাঁপড় বানিয়ে বিক্রি করি।'

'লাভ কেমন থাকে?'

'হর মাহিনা একশ দেড়শ। তবে সম্‌সারের সব কাম সেরে সময় তো বেশি পাই না। তা হলে আরো কিছু কামাই হত।'

'আপনাদের সংসারে কতজন লোক?'

'সাত। আমি, আমার মরদ আউর পাঁচ বাচ্চা। আউর—' বলতে বলতে থেমে যায় লছমী।

'আর কী?'

'আমার বুড্ডী সাসও (শাশুড়ি) থাকে আমাদের সঙ্গে।'

'সবসুদ্ধ আপনারা আটজন। আয় মোটে সাড়ে তিনশ চারশ টাকা। এতে সংসার চালানো তো মুশকিল।'

'হাঁ। বহোত মুসিবত—' তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করে সায় দেয় লছমী।

অদিতি বলে, 'এত ছেলেপুলে হওয়া ভাল না। তাদের মানুষ করে তোলা কি সোজা কথা!'

চোখের কোণ দিয়ে অদিতিকে লক্ষ করতে করতে ঠোঁট কামড়ে হাসতে থাকে লছমী। ঝপ করে গলার স্বর অনেকটা নিচে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'এ আপনি কি বলছেন দিদিজি! শাদি হয়েছে, মরদের পাশে শুয়ে রাত কাটাচ্ছি। মরদ বুকের ওপর তুলে আমাকে আধি রাত পর্যন্ত আটার মতো ডলছে। আর বাচ্চা হবে না!' বলে সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে অদিতির সিঁথি এবং কপাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

তার চাউনির মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে অদিতি। বিব্রতভাবে বলে, 'কী দেখছেন!'

'কপালে সিন্দুর (সিঁদুর) নেই। আপনার শাদি হয়নি—তাই না দিদিজি?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'শাদি হলে দেখতেন, আপনার মরদ কিভাবে সুহাগ করত!' বলতে

বলতে কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে আনে, 'আর সুহাগ পেলে দেড় দো সাল পর পর একটা করে বাচ্চা পয়দা করে ফেলতেন। দুনিয়ার এই নিয়ম দিদিজি।'

বস্তিবাসী এই মেয়েমানুষটির মুখে কিছুই আটকায় না। লাল হয়ে ওঠে অদিতির কান, নাকমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। ওধারে বেঞ্চে বসে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রয়েছে বিশাখা। বোঝা যায়, অবরুদ্ধ হাসির তোড় গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। প্রাণপণে সে সেটা আটকে রেখেছে। ফলে তার চোখমুখও লাল হয়ে উঠেছে।

আচমকা বিশাখার দিকে ফিরে লছমী বলে, 'দিদিজি, আপনিও রেহাই পাবেন না। বুঝবেন মরদের সুহাগ কাকে বলে!'

এরকম অভাবিত আক্রমণে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে বিশাখা। বিপন্ন মুখে বলে, 'কী আজেবাজে বলছেন!'

'আজেবাজে নহী দিদিজি, জীওনের এই হল আসলী বাত। শাদিটা একবার হোক না আপনার, তখন—'

লছমীকে থামিয়ে দিয়ে অদিতি বলে, 'ও-সব আলোচনা থাক। কাজের কথা হোক।' একটু আগের বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে সে। গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্ব ফিরে এসেছে তার চোখে-মুখে এবং কণ্ঠস্বরে।

লছমী সোজা হয়ে বসে, শান্ত চোখে তাকায় অদিতির দিকে। তার চাউনির মধ্যে একটু আবেগ চটুলতার চিহ্ন নেই।

অদিতি এবার বলে, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। ঠিক ঠিক জবাব দেবেন—'

'হাঁ, জরুর।'

'আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কেমন?'

গালের ভেতর জিভটা ঘোরাতে ঘোরাতে লছমী বলে, 'নয়া কী আর হবে! দুনিয়ার সব আদমী আর জেনানাদের মধ্যে যেমন হয় আমাদেরও তেমনি।'

অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'আপনার স্বামী আপনাকে ভালবাসে?'

এই একটি প্রশ্নে আবার লছমীর চটুলতা ফিরে আসে। নিচু তারে কণ্ঠস্বরকে বেঁধে রেখে রিন রিন করে সে হেসে ওঠে, 'এ কী বলছেন দিদিজি, সুহাগই যদি না করবে, পাঁচ-পাঁচটা বাচ্চা পয়দা হলো কী করে!'

এই খোলা জায়গায়, যেখানে লোকজন থিক থিক করছে, এ জাতীয় ইন্টারভিউ নেওয়া খুবই অস্বস্তিকর। বিশেষ করে লছমীর মতো মুখ-আলগা হালকা টাইপের মেয়েমানুষদের। অদিতি দ্রুত ভেবে নেয়, ইন্টারভিউগুলো অন্যভাবে নিতে হবে। সে বলে, 'আপনার স্বামী কখনও খারাপ ব্যবহার করে না?'

'হো রামচন্দজি, করে আবার না!' দুই হাত প্যাকিং বাক্সের ওপর লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে লছমী বলে, 'না করলে এই দাগগুলো কিসের দিদিজি?'

লছমীর দুই হাতের উল্টো পিঠ থেকে ব্লাউজের হাতা পর্যন্ত খোলা জায়গায় চামড়ার ওপর অগুনতি কালশিটে পড়ে আছে।

কোনো কোনোটা পুরনো, কিছু কিছু একেবারে তাজা।

অদিতি এবং বিশাখা শিউরে ওঠে। একই সঙ্গে বলে, 'এভাবে মেরেছে আপনাকে !'

'বা-রে, মারবে না ! এখানে এত্তে আদমী দাঁড়িয়ে আছে। নইলে জামা-কাপড় খুলে দেখিয়ে দিতাম সারা গায়ে কত দাগ। অনেক জায়গায় চামড়া ফেটে ঘা হয়ে রয়েছে।'

'এভাবে মারে, আর আপনি কিছু বলেন না !'

কী বলব, দিদিজি ! মরদ সুহাগও করবে, আবার পিটাইও লাগাবে। পিটাই না দিলে আওরতকে কি মুঠির ভেতর রাখা যায় !' বলতে বলতে একটু থামে লছমী। দম নিয়ে পরক্ষণে আবার শুরু করে, 'আমার মরদটা যখন দারু খেয়ে ঘরে ফেরে তখন কি তার হোঁশ থাকে ! হাতের কাছে যা পায় তা-ই দিয়ে পিটাই করে।'

অদিতি লক্ষ করল, লছমী এক নাগাড়ে এই যে বলে গেল, এতে বিন্দুমাত্র অভিযোগের সুর নেই। স্বামীর হাতে মার খাওয়ার বিবরণ এমন নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সে দিয়েছে যাতে মনে হয় এটাই দৈনন্দিন জাগতিক নিয়ম।

অদিতি কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বস্তির ভেতর থেকে মেয়ে গলার একটানা তীক্ষ্ন বুকফাটা চিৎকার ভেসে আসে। সে এবং বিশাখা চমকে সেদিকে তাকায়।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, বস্তি থেকে বেরিয়ে একটি মেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে এবং চিৎকার করতে করতে এদিকে আসছে। তার খোলা চুল বাতাসে উড়ছে, পরনের শাড়ি এলোমেলো, আঁচল বুক থেকে খসে মাটিতে লুটোচ্ছে।

অদিতি বুঝতে পারে, এই মেয়েটিরই গলা একটু আগে তাদের কানে ভেসে এসেছিল।

বিমূঢ়ের মতো মেয়েটিকে দেখছিল অদিতি। তার এভাবে ছুটে আসার কারণ কিন্তু একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না।

মেয়েটি কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা এসে অদিতির সামনে লুটিয়ে পড়ে। তার দুই পা বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে বলে, 'আমাকে বাঁচান দিদি—'

মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ, বিবাহিত। কপালে সিঁদুর লেপ্টে আছে। মাথা থেকে চুলের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে, হাতে ঘাড়ে এবং কণ্ঠায় চাপ চাপ রক্ত। থুতনির কাছে মাংসের একটা রক্তাক্ত ডেলা প্রায় ঝুলছে। তার গায়ে যে এলোপাথাড়ি কোনো ধারাল অস্ত্র-টস্ত্র চালানো

হয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। সমানে কেঁদে চলেছে সে। চোখের জল এবং রক্তে তার মুখ প্রায় মাখামাখি।

ঘটনাটা এতই আকস্মিক এবং অভাবনীয় যে প্রথমটা হকচকিয়ে যায় অদিতি। পরক্ষণেই শিউরে ওঠে। বিহ্বলের মতো সে বলে, 'ওঠ, ওঠ। তোমার এ অবস্থা কী করে হল?'

মেয়েটি পা ছাড়ে না। কান্না ভেজা বিকৃত গলায় বলে, 'সব বলব, আগে বলুন আমাকে বাঁচাবেন।'

এমন অদ্ভুত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আগে আর কখনও পড়েনি অদিতি। কোন্ বিপদ থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে হবে, সেটা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব কি না, আগে না জেনে কথা দেওয়া যায় না। হাত ধরে তাকে পায়ের কাছ থেকে তুলে সামনের বেঞ্চে বসিয়ে দিতে দিতে ব্যস্তভাবে বলে, 'আগে একজন ডাক্তার দেখানো দরকার। যুধিষ্ঠিরদা, যুধিষ্ঠিরদা—' বলতে বলতে সে চায়ের দোকানটার দিকে মুখ ফেরায়।

সেখান থেকে যুধিষ্ঠির, বিকাশ এবং আরো দু-চারজন বেরিয়ে আসে। জলের কলের ওধারে যে ভিড়টা সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো অনড় দাঁড়িয়ে ছিল, এবার তারা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে।

অদিতি যুধিষ্ঠিরকে বলে, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন একজন ডাক্তার ডেকে আনুন যুধিষ্ঠিরদা—'

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করে, 'কেন, ওই চাঁপার জন্যে?' বলে আঙুল বাড়িয়ে মেয়েটির ক্ষতবিক্ষত মুখের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

'হ্যাঁ। দেখছেন না, কী হাল হয়েছে এর—'

অদিতির উৎকণ্ঠাকে এতটুকু গুরুত্ব দেয় না যুধিষ্ঠির। বলে, 'এ নিয়ে ভাববেন না দিদিমণি। রোজ বস্তিতে এরকম ঠেঙানোর ঘটনা বিশ-পঞ্চাশটা করে ঘটছে। রাত দশটা পর্যন্ত একদিন এখেনে থাকলে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন কতগুলোন মেয়েছেলে জখম হল! ডাক্তার ডেকে কি কূল পাবেন। তা হলে এখেনে হাসপাতাল বসিয়ে দিতে হয়।'

দেখা গেল, চারধারের লোকজনের মধ্যেও কোনোরকম চাঞ্চল্য নেই। বস্তিতে মেয়েমানুষ পেটানো রোজকার রুটিনের একটা আইটেম। ঘরে ঘরে এটা হল চিরাচরিত অভ্যাস। এ সব বিচলিত হবার মতো ঘটনাই নয়।

অদিতি বলে, 'না না, এগুলো কোনো কাজের কথা নয়। এখনই ডাক্তারকে খবর দিন।'

'আপনি পয়লা দিন দেখলেন তো, তাই ঘেবড়ে গেছেন। ডাক্তার ডেকে গুচ্ছের পয়সা নষ্ট করে লাভ নেই। চাঁপা রোজ জখম হচ্ছে, রোজ ঘা শুকিয়ে যাচ্ছে। যে ভাতার ঠেঙাচ্ছে আবার তার জন্যেই উনুন ধরিয়ে ভাত রাঁধবে। ভয়ের কিছু নেই!'

যুধিষ্ঠিরের অবিচলিত অটল মনোভাব অদিতির স্নায়ুকে ধাক্কা দিয়ে যায়। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মোটা কর্কশ গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে বস্তির দিক থেকে মাংসল ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা মধ্যবয়সী একটা লোক বেরিয়ে আসে। তার রুক্ষ চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। রক্তবর্ণ চোখ, থ্যাবড়া থুতনি, গোল মুখ, মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে মজবুত শরীর—সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে মারাত্মক নিষ্ঠুরতা। এক পলকেই বোঝা যায় লোকটা অনায়াসে খুন করে ফেলতে পারে।

তার হাতে রয়েছে একটা ভোঁতা নিরেট কাটারি। তাকে দেখে লোকজন সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে সরে সরে পথ করে দিল। লোকটা ক্রুদ্ধ কর্কশ গলায় চেঁচিয়েই যাচ্ছে, 'কোথায় গেলি খানকি মাগী, আজ তোর বাপের বিয়ে দেখিয়ে ছাড়ব।'

সামনের বেঞ্চ থেকে উঠে দ্রুত অদিতির পাশে গিয়ে দাঁড়ায় চাঁপা। ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছে সে। সারা শরীর থরথর কাঁপছে। আড়ষ্ট গলায় বলে, দিদি, ও আমাকে নির্ঘাত মেরে ফেলবে।'

বোঝা গেল, হাতের ওই কাটারিটা দিয়ে কিছুক্ষণ আগে এই লোকটাই নির্দয়ভাবে চাঁপাকে মারধোর করেছে। অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা কে?'

ওধার থেকে যুধিষ্ঠির নিচু গলায় জানায়, 'ও লগা—লগেন দাস। হেভি মাস্তান দিদিভাই। মাথায় রক্ত চড়লে ও যা খুশি করে ফেলতে পারে। হাতের সামনে যা পায়—লাঠি, ছুরি, বঁটি, দা—চালিয়ে দেয়। চাঁপা লগার তিন নম্বর ওয়াইফ।'

যদিও যুধিষ্ঠির এই বস্তির একজন মান্যগণ্য নেতাগোছের লোক, তবু অদিতি টের পেল নগেনকে যথেষ্টই ভয় পায় সে। আরও জানা গেল, লোকটার তিন তিনটে স্ত্রী। তবে তিনজনই জীবিত কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। থাকলে, ধরে নেওয়া যায়, হিন্দু কোড বিলকে বুড়ো আঙুল দেখাবার হিম্মত রাখে নগেন। লোকটা বেপরোয়া, ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক।

এ রকম মারাত্মক একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে, বস্তিতে আসার আগে ভাবতেই পারেনি অদিতি। তার মতো স্মার্ট সাহসী মেয়েও প্রথমটা রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। বিমূঢ়ের মতো নগেনের দিকে তাকিয়ে থাকে সে!

চারপাশের জনতা সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নগেন এলোমেলো পা ফেলে এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসে। সে ভিড়ের মধ্যে চাঁপাকে খুঁজছে।

এদিকে আতঙ্কে অদিতির পিঠে একেবারে লেপ্টে গেছে চাঁপা। অদিতি বুঝতে পারে, মেয়েটা এত কাঁপছে যে বোধ হয় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, হুড়মুড় করে নিচে পড়ে যাবে। পেছন থেকে ভয়ার্ত ঝাপসা গলায় চাঁপা বলে, 'আমাকে বাঁচান দিদি—'

চাঁপার কথা যেন শুনতেই পায় না অদিতি। তার দুই চোখ নগেনের ওপর স্থির হয়ে আছে।

শেষ পর্যন্ত চাঁপাকে দেখতে পায় নগেন। তার চোখে মুখে অদ্ভুত এক হিংস্রতা যেন ঝিলিক দিয়ে যায়। লম্বা লম্বা লালচে চুলগুলো এক ঝটকায় পেছন দিকে সরিয়ে অদিতির দিকে এগিয়ে আসে সে। বাঁ হাতে কাটারিটা বাগিয়ে ধরা। ডান হাতের আঙুল নাচাতে নাচাতে বলে, 'বেরিয়ে আয় মাগী, আভ ভি—আভ্‌ভি—'

চাঁপা উত্তর দেয় না, তার কাঁপুনি আরও কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

অদিতিও কী করবে, কী বলবে, প্রথমটা ভেবে উঠতে পারে না। এমন অস্বস্তিকর মারাত্মক পরিস্থিতিতে আগে আর কখনও পড়ে নি সে।

নগেন কর্কশ, ভোঁতা গলা চড়িয়ে শাসাতে থাকে, 'কথা কানে ঢুকচে না! চলে আয় শালী, চলে আয়—'

হঠাৎ স্বয়ংক্রিয় কোনো নিয়মে অদিতির মাথার ভেতর কিছু একটা ঘটে যায় যেন। নিজের অজ্ঞান্তেই শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'চুপ কর জানোয়ার—'

এক ধমকেই কিছুটা কাজ হয়। নগেন প্রথমটা হকচকিয়ে যায় এবং এগিয়ে আসতে আসতে প্যাকিং বক্সটার ওধারে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মুখ থেকে ভক ভক করে গন্ধ বেরিয়ে আসছে। এখনও অনেকটা বেলা রয়েছে, চারিদিকে রোদের ছড়াছড়ি। এরই মধ্যে সে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দিশী মদ গিলেছে।

ধাতস্থ হতে খানিকটা সময় লাগে নগেনের। সে চোখ সরু করে অদিতিকে লক্ষ করতে থাকে। নেশা-টেশা করলেও বুঝতে পারে, বস্তির লোকজনের ওপর যে মেজাজ চালানো যায়, এর কাছে সেটা চলবে না। অদিতিকে কিছু না বলে নগেন চাঁপাকে ডাকতে থাকে, 'ভাল চাস তো চলে আয় চাঁপা—'

চাঁপা এবারও উত্তর দেয় না, অদিতির শরীরের সঙ্গে নিজেকে প্রায় মিশিয়ে দেয়।

অদিতি বুঝতে পারছিল, ভয় পেলে নগেন একেবারে মাথায় চড়ে বসবে। কোনো ভাবেই সেটা হতে দেওয়া যায় না। রুক্ষ গলায় সে বলে, 'চাঁপা এখন যাবে না। তুমি এখান থেকে চলে যাও—'

কেউ যে নগেনের মুখের ওপর এভাবে বলতে পারে, বস্তির লোকজনের কাছে তা ছিল অভাবনীয়। তারা একেবারে হাঁ হয়ে যায়।

দাঁতে দাঁত চেপে নগেন ভেংচে ওঠে, 'অর্ডার দিচ্ছেন নাকি মেমসাহেব?'

অদিতি বলে, 'অর্ডার নয়। কোথাও গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে ভদ্রলোকের মতো এসো। তখন কথা হবে।'

'ভদ্দরলোক! বস্তিতে ভদ্দরলোক থাকে বলে শুনেচেন! মাতাল

ফোরটোয়েন্টি খচ্চর হারামী ছাড়া এখানে কেউ থাকে না মেমসাহেব। আমি তাদের ভেতর আবার সব চাইতে ওঁচা মাল। অনেক ভ্যানতাড়া হয়েচে। এবার মাগীটাকে পিঠের কাছ থেকে টেনে বার করে দিন। শালীর চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যাই।'

'মেয়েটার কী হাল হয়েছে—দেখেছ?'

'মরে তো যায়নি।'

'তুমি মানুষ, না কী?'

'এট্টু আগে যা বলেছেন তাই—জানোয়ার।'

মাথার ভেতর রক্ত ফুটতে শুরু করেছিল অদিতির। উত্তেজিত ভঙ্গিতে সে বলে, 'চাঁপা না তোমার স্ত্রী!'

নগেন বলে, 'সেই জন্যেই তো ঠেঙাতে পারছি। অন্য মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে ঝামেলা হয়ে যেত। মেলাই ভ্যাজর ভ্যাজর করছেন মেমসাহেব, আমার মাল আমার হাতে তুলে দিন। কেটে পড়ি।'

কোনো লোক যে এমন ইতরের মতো কথা বলতে পারে ভাবা যায় না। বোঝাই যাচ্ছে চাঁপাকে নিয়ে গিয়ে আবার মারবে নগেন। নিজেকে শক্ত করে নেয় অদিতি। কঠিন গলায় বলে, 'না, দেবো না।'

যুধিষ্ঠির বকের মতো গলা বাড়িয়ে কানের কাছে ফিস ফিস করে, 'চাঁপাকে দিয়ে দ্যান দিদিমণি। নগেন খুব হারামী লোক—'

যুধিষ্ঠিরের কথার জবাব দেয় না অদিতি, পলকহীন নগেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্রমশ তার মাথার ভেতর অদম্য জেদ যেন চেপে বসতে থাকে। জেনেশুনে লোকটার হাতে এই মুহূর্তে চাঁপাকে তুলে দেওয়া যায় না।

যেন প্রচণ্ড অবাক হয়েছে, এমন একটা ভঙ্গি করে নগেন বলে, 'আমার বউকে আটকে রাখবেন! এ তো গা-জোয়ারী কারবার হল মেমসাহেব।' বলতে বলতে টেবলের পাশ দিয়ে সে এগিয়ে আসে। তার চোখে মুখে ধীরে ধীরে আগের সেই বেপরোয়া হিংস্রতা ফের ফুটে উঠতে থাকে।

বিপজ্জনক কিছু একটা আঁচ করে রমেন এবং বিকাশ দ্রুত মাঝখানে চলে এসে অদিতিকে আড়াল করে দাঁড়াতে চায়। অদিতি তাদের সরিয়ে দিয়ে তীব্র চাপা গলায় নগেনকে বলে, 'এক পা-ও আর এগুবে না।' সে টের পায় তার কণ্ঠস্বর থেকে আগুনের ঝলকের মতো কিছু একটা বেরিয়ে আসছে।

নগেন থমকে যায়। বলে, 'আমাকে অত ধমকাবেন না মেমসাহেব, আমি আপনার বাবার চাকর লই। ভাল কথায় বলচি আমার বউকে ছেড়ে দ্যান।'

'না।'

নগেন বলে, 'ভদ্দরলোকের বাড়ির মেইয়ে বলে এতক্ষণ খাতির করে কথা কইচি। এরপর কিন্তুক ঝামেলা হয়ে যাবে।' বলতে বলতে নগেনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠতে থাকে, 'কদিন ধরেই খবর পাচ্ছি আপনারা বস্তির মেয়ে-

মানুষদের খেপিয়ে যাচ্ছেন। আমায় ঘাঁটাননি তাই কিছু বলিনি। এবার কিন্তু সাপের ন্যাজে পা দিয়ে ফেলেচেন। আপনাকে আমি ছাড়চি না।'

মস্তিষ্কের মধ্যে কোথায় যেন বিস্ফোরণ ঘটে যায় অদিতির। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো সে চিৎকার করে ওঠে, স্কাউন্ড্রেল, এতবড় সাহস তোমার। তোমাকে আমি পুলিশে দেবো।'

পুলিশের নামে খানিকটা দমে যায় নগেন। পরক্ষণেই তেরিয়া হয়ে ওঠে, 'আমাকে পুলিশের ভয় দেখাবেন না মেমসাহেব। বছরে বিশ বার ধরা পড়ি। এক ঘন্টার বেশি কেউ আমাকে ধরে রাখতে পারেনি। পুলিশ মাকড়াদের আমার বহোত দেখা আচে।'

অদিতি নগেনের চোখ থেকে চোখ সরায়নি। অত্যন্ত শান্ত গলায় বলে, 'বছরে যাতে বারো মাস জেলে কাটাতে পার তার ব্যবস্থা করে দেবো।'

হইচই এবং উত্তেজনায় নগেনের নেশা অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছিল। অদিতি তার কতটা ক্ষতি করতে পারে, ঠিক বুঝতে পারছিল না। মেয়েমানুষের মুখে এমন কড়া শাসানি আগে আর শোনেনি সে। দেখেই টের পাওয়া যাচ্ছে ভাল ঘরের মেয়ে। বড় পুলিশ অফিসার আর মন্ত্রীটন্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কিনা কে জানে। কাজেই সতর্ক হওয়া দরকার। সাপের মতো শীতল দৃষ্টিতে অদিতিকে কিছুক্ষণ লক্ষ করে সে, তারপর বলে, 'আপনার মতলবটা কী?'

'চাঁপাকে নিয়ে আমি সোজা এখান থেকে থানায় যাব।'

নগেন ভেতরে ভেতরে খানিকটা দমে যায়। কিন্তু যে দাপট আর তেজ সে দেখিয়ে ফেলেছে সেখান থেকে এখন ফেরাটা একটু মুশকিল। তা হলে বস্তির লোকেদের কাছে মান থাকবে না। একটা মেয়েমানুষের ধমকে যে নেতিয়ে পড়ে কেউ কি তাকে ভয় পায়! নগেন কড়া ভাবটা বজায় রেখে বলে, 'যেখেনে খুশি নিয়ে যান। শুদু দুটো কথা মন দিয়ে শুনে রাখুন। এক লম্বর, লগেন দাসকে আপনি চেনেননি। দু লম্বর, ওই মাগীকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন কোন বাপ ওকে বাঁচায় দেখব—' বলে আর দাঁড়ায় না, ভিড়ের ভেতর দিয়ে বস্তির গোলকধাঁধায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

যুধিষ্ঠির পাশ থেকে বলে, 'কাজটা ভাল হল না দিদিমণি।'

বস্তির আরো দু-চারজন বয়স্ক লোক এগিয়ে এসে বলে, 'দিদিমণি, চাঁপাকে লগেনের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিন। সোয়ামী-ইস্তিরির কারবার। এখন গেলে লগা ঠেঙাবে ঠিকই, আবার মিটমাটও হয়ে যাবে।'

একটু দ্বিধান্বিতই হয়ে পড়ে অদিতি। এই বস্তিতে দাম্পত্য জীবনের প্যাটার্নটা কিরকম, সে সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা নেই। চাঁপার দিকে ফিরে বলে, 'তুমি কি ঘরে ফিরে যাবে?'

চাঁপা ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল। বলে, 'না না, ওর কাছে আর যাব না।

আপনি পুলিশের ভয় দেখিয়েছেন। আমাকে পেলে একেবারে খুন করে ফেলবে। আপনি আমাকে বাঁচান দিদি।'

ঠিকই বলেছে চাঁপা। এখন যদি নগেনের কাছে চাঁপাকে পাঠিয়ে দেয় তার প্রতিক্রিয়া হবে দুরকম। প্রথমত, নগেন ঠাউরে নেবে, ভয় পেয়ে অদিতি চাঁপাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেটাও না হয় মেনে নেওয়া গেল কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাপারটা অনেক বেশি ভয়াবহ। নগেন অদিতিকে কিছু করতে পারেনি। কিন্তু তার ওপর যত রাগ আর রোখ, সব গিয়ে পড়বে চাঁপার ওপর। ফলে নির্যাতনটা কতদূর ভয়ঙ্কর হতে পারে, ভাবতে সাহস হয় না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে অদিতি বলে, 'ঠিক আছে, আপাতত আমাদের সঙ্গে চল। তারপর ভেবে কিছু একটা ঠিক করা যাবে।' যুধিষ্ঠিরকে বলে, 'আজ আর অন্য কোনো মহিলাকে ডাকার দরকার নেই।' বিকাশ এবং রমেনকে পোস্টারগুলো তুলে ফেস্টুনটা খুলে নিতে বলে এরপর যুধিষ্ঠিরকে একধারে ডেকে নিয়ে গোটাকয়েক টাকা দেয়।

এটা যুধিষ্ঠিরের কাজের মজুরি। যুধিষ্ঠির টাকাটা পকেটে পুরতে পুরতে বলে, 'চাঁপাকে সন্গে করে না নিয়ে গেলেই পারতেন দিদিমণি।'

এই সৎ পরামর্শটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে এবং বস্তির কয়েকজন কিছুক্ষণ আগেই একবার দিয়েছে। অদিতি হাসে। তারপরেই হঠাৎ কিছু মনে পড়তে সে বলে, 'চাঁপার ছেলেমেয়ে আছে?'

'না।'

'ভালই হল। বাচ্চাকাচ্চা থাকলে অসুবিধা হত।'

গলা অনেকখানি নামিয়ে যুধিষ্ঠির বলে, 'দিদি, একটা কথা বলব?'

অদিতির কপাল সামান্য কুঁচকে যায়। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'এট্টু সাবধানে থাকবেন। লগা হারামজাদাকে নিজের চোখেই দেখলেন। শুনেছি পাট্টির লীডাররা আছে ওর পেছনে।'

পাট্টি মানে পলিটিকাল পার্টি। এতক্ষণে বোঝা যায়, রাজনৈতিক নেতাদের মদতেই নগেন দাস এমন বেপরোয়া হয়ে উঠতে পেরেছে। অন্য-মনস্কর মতো অদিতি বলে, জানা রইল।'

'এখন কিছুদিন বস্তিতে আসবেন না।'

যুধিষ্ঠির তার সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী। বস্তিতে এলে নগেন ঝঞ্ঝাট বাধাতে পারে, সেই ভয়ে সে আসতে বারণ করছে। তার মানে, দারিদ্র্যসীমার নিচে ক্যালকাটা মেট্রোপলিসের বস্তিবাসী মেয়েদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের যে বিপুল পরিকল্পনা তারা নিয়েছে, সেটা স্থগিত রাখতে হবে। একটু চিন্তা করে অদিতি বলে, 'দেখা যাক।' কিন্তু মনে মনে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। কাজ যখন শুরু করা হয়েছে কারো ভয়ে পিছিয়ে যাবে না। এইরকম সমস্যা নিশ্চয়ই আরো দেখা দেবে। সেগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে। পিছিয়ে

গেলে কোনো ভাল কাজই তো করা যাবে না। 'নারী-জাগরণ' মেয়েদের সম্পর্কে যে সব কর্মসূচি নিয়েছে তা একেবারেই মসৃণ নয়। তারা বস্তিতে যেমন আসছিল তেমনই আসবে।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, অদিতিরা চাঁপাকে নিয়ে সামনের গলিটা দিয়ে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পেছনে বস্তির লোকজন বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

তিন

আগে আগে হাঁটছে রমেন বিশাখা এবং চাঁপা। তাদের পেছনে অদিতি আর বিকাশ।

বিকাশ নিচু গলায় অদিতিকে বলে, 'এটা তুমি কি করলে?'

দূরমনস্কর মতো হাঁটছিল অদিতি। চমকে উঠে বলে, 'কোনটা?'

চাঁপাকে দেখিয়ে বিকাশ বলে, 'এই যে মেয়েটাকে নিয়ে এলে—' বলতে বলতে সে থেমে যায়।

তার ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হয় না অদিতির। সে বলে, 'না নিয়ে এলে মেয়েটার অবস্থা কী হত, নিশ্চয়ই তোমাকে বলে দিতে হবে না।'

'তোমার কি মনে হয়, ওই মাস্তানটা ওকে খুন করে ফেলত? খুনটা এত সোজা ব্যাপার না।'

'আজকাল ওটাই বোধহয় সবচেয়ে সোজা হয়ে গেছে। নগেন ওকে হয়ত একেবারে শেষ করে ফেলত না, তবে মারাত্মক টরচার করত।'

'শুনলে তো এখানে ওইরকম বউ পেটানোর ঘটনা রোজ হাজারটা ঘটছে। নগেনের কেসটা নতুন কিছু নয়। এই টাইপের ইললিটারেট স্কাউন্ড্রেলরা বউ পেটানোকে নিজেদের বার্থরাইট বলে ধরে নিয়েছে। তুমি সবাইকে বাঁচাতে পারবে?'

'একজনকেও যদি পারি সেটাই কম নাকি?'

চাঁপাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসাটা আদৌ পছন্দ হয়নি বিকাশের। সে কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে। তারপর বলে, 'সব ব্যাপারে তুমি নিজেকে বড় বেশি ইনভল্‌ভ করে ফেল অদিতি—'

চোখের কোণ দিয়ে বিকাশকে লক্ষ করতে করতে ঈষৎ তীক্ষ্ন গলায় অদিতি বলে, 'সোসাল ওয়ার্ক করতে নেমেছি অথচ এতটুকু দায়দায়িত্ব নেব না, তাই কখনও হয়? এসব কাজে সীরিয়াসলি নিজেদের জড়িয়ে না ফেললে সমস্ত ব্যাপারটাই মীনিংলেস হয়ে দাঁড়ায়।'

'আমাদের কাজ হল, মেয়েদের সম্বন্ধে ইনফরমেশন জোগাড় করে সেগুলো নানা মিডিয়ার হেল্প নিয়ে দেশের মানুষ আর গভর্নমেন্টকে জানানো। আই

মীন, এই সোসাইটিতে মেয়েরা কীভাবে জেনারেশনের পর জেনারেশন কী ভয়ঙ্কর জীবন কাটাচ্ছে, সে সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা।' বলে একটু থামে বিকাশ। কী ভেবে ফের শুরু করে, 'আবেগ জিনিসটা খারাপ নয়, তবে তাতে সবসময় ভেসে যাওয়াটা—'

বিকাশকে থামিয়ে দিয়ে সুরহীন ভারী গলায় অদিতি বলে, 'বুদ্ধিমানের কাজ নয়, এই কথাটাই বোঝাতে চাইছ নিশ্চয়ই।'

বিকাশ চুপ করে থাকে। অর্থাৎ তার মুখ থেকে যা বেরুত সেটাই বলে ফেলেছে অদিতি।

চলতে চলতে বিকাশের দিকে মুখ ফেরায় অদিতি। বলে, 'তার মানে নিজের চামড়া বাঁচিয়ে, হিসেব কষে যেটুকু করা যায়—তাই না?'

অদিতির চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে চাবুকের মতো এমন কিছু শ্লেষ ছিল যাতে চমকে ওঠে বিকাশ। কিছু বলতে গিয়ে সে থেমে যায়। মেয়েটা শান্ত নম্র এবং অত্যন্ত ভদ্র হলেও ভেতরে ভেতরে ভীষণ জেদী এবং একগুঁয়ে সেটা তার অজানা নয়। অদিতি যদি কোনো ব্যাপারে একবার সিদ্ধান্ত নেয় সেখান থেকে তাকে ফেরানো খুবই দুরূহ।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর বিকাশ বলে, 'মেয়েটাকে তো নিয়ে এলে। এখন ওর কী ব্যবস্থা করবে? কোথায় রাখবে?'

অদিতি বলে, 'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে আগে যাই। অমিতাদির সঙ্গে আলোচনা করে একটা কিছু করতে হবে।'

বিকাশ আর কোনো প্রশ্ন করে না। তবে চাঁপার ব্যাপারে সে যে ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত এবং বিরক্তও তার চোখমুখ দেখেই তা টের পাওয়া যায়।

'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে যখন অদিতিরা এসে পৌঁছয়, সন্ধে নেমে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের তেজী আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।

দক্ষিণ কলকাতার এই নিরিবিলি পাড়ার সন্ধেবেলাতেও লোকজন খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দু একটা স্কুটার, অটোরিকশা বা প্রাইভেট কার এখানকার অগাধ শান্তিকে তোলপাড় করে হুস হুস শব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'নারী-জাগরণ'-এর অফিসটা দুপুরের মতো অতটা জমজমাট না হলেও বেশ কিছু মেম্বার এঘরে ওঘরে উত্তেজিতভাবে গলা চড়িয়ে কথা বলছে। অমিতাদিকেও সামনের ঘরে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে থাকতে দেখা গেল।

বোঝা যায়, বধূহত্যার প্রতিবাদে দুপুরে মিছিল করে 'নারী-জাগরণ'-এর মেম্বাররা যে বেরিয়ে পড়েছিল, নানা রাস্তা ঘুরে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে মেমো-

রেন্ডাম জমা দিয়ে তারা ফিরে এসেছে। এখন সেই বিষয়েই তাদের আলোচনা চলছে।

অদিতি ভেতরের একটা ঘরে চাঁপাকে বসিয়ে সামনের ঘরে এসে অমিতাদির মুখোমুখি বসে পড়ে। বিকাশ রমেন এবং বিশাখা আগেই অফিসে ঢুকে অমিতাদির ঘরে থেকে গিয়েছিল। তারা আর তাদের সঙ্গে চাঁপাকে নিয়ে ভেতরে যায়নি।

অমিতাদি বলেন, 'যে মেয়েটিকে ওঘরে রেখে এলে সে কে ?'

অদিতি দ্রুত একবার বিকাশদের দেখে নেয়। বুঝতে পারে, ওরা চাঁপার সম্পর্কে এখনও কেউ কিছু অমিতাদিকে জানায়নি।

অদিতি সংক্ষেপে চাঁপার ব্যাপারটা বলে, কী পরিস্থিতিতে তাকে এখানে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে জানিয়ে দেয়।

শুনতে শুনতে কপালে ভাঁজ পড়ে অমিতাদির। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেন. 'তাই তো, এখানে ওকে নিয়ে এলে !'

'না এনে উপায় ছিল না অমিতাদি। আপনি আমার জায়গায় থাকলে কী করতেন ?'

অমিতাদি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কী ভাবেন, তারপর বলেন, 'ডিফিকাল্ট কোশ্চেন। যাই হোক, এনেই যখন ফেলেছ তখন ওর সম্পর্কে আমাদের একটা দায়িত্ব এসে গেছে ! চাঁপাকে নিয়ে কী করবে, কিছু ভেবেছ ?'

'না। আপনি কী করতে বলেন ?'

অমিতাদি বলেন, 'প্রথমে যেটা সব চাইতে জরুরি তা হল, থানায় ওর সম্পর্কে একটা রেকর্ড করিয়ে রাখা। নইলে পরে ওর স্বামী—মানে হুলিগান টাইপের সেই লোকটা গোলমাল বাঁধাতে পারে।'

'কিন্তু—'

'বল।'

'চাঁপাকে তো আমি জোর করে আনিনি। সে প্রাণের ভয়ে স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে চলে এসেছে। বস্তির লোকেরা সব দেখেছে। দরকার হলে তাদের সাক্ষী হিসাবে পাওয়া যাবে।'

অমিতাদি আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন, বলেন, 'তোমার সব কথাই ঠিক। কিন্তু নগেন লোকটা যে ভীষণ গোলমেলে আর ট্রাবলসাম ! ওদের না ঘাঁটানোই ভাল। তবু যখন—' বলতে বলতে থেমে যান।

অদিতি ভেতরে ভেতরে একটু ক্ষুণ্ণই হয়। অমিতাদি যেন অনেকটা বিকাশের সুরেই কথা বলছেন। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে যতটা সমাজ সেবা করা যায় তার বেশি ঝুঁকি নিতে এঁরা বোধহয় রাজী নয়। অদিতি বলে, 'আমরা যে ধরনের কাজে হাত দিয়েছি তাতে রিস্ক নিতেই হবে অমিতাদি।'

অদিতির কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ ঝাঁঝ ছিল। অমিতাদি চকিত হয়ে ওঠেন,

'ইউ আর সেণ্ট পারসেণ্ট কারেক্ট। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?

'নগেনের কী সব পলিটিকাল কানেকসন আছে না? সেটাই গোলমেলে ব্যাপার।'

উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে ব্যস্তভাবে অদিতি বলে, 'অমিতাদি, আই অ্যাম স্যরি, আমাকে এখন বাড়ি যেতে হবে। বাবা বলে দিয়েছিল, সন্ধের আগে আগেই যেন ফিরে যাই।' ঘড়ি দেখতে দেখতে বলে, 'ভীষণ দেরি হয়ে গেছে।'

আজ বাড়িতে নিশ্চয়ই এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার রয়েছে যে চাঁপা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত হবার আগেই তাকে চলে যাবার কথা বলতে হচ্ছে।

অমিতাদি জানেন, অদিতির দায়িত্ববোধ প্রচণ্ড। কোনো কাজ হাতে নিলে সেটা শেষ না করে ছাড়ে না। চাঁপার দায়িত্ব সাধারণ ভাবে 'নারী-জাগরণ'-এর। তা সত্ত্বেও তাকে যখন বস্তি থেকে অদিতিই তুলে এনেছে তার অনেকখানি দায় তারই। অমিতাদি বলেন, 'ঠিক আছে, তুমি যাও—'

অদিতি বলে, 'চাঁপার সম্বন্ধে কী ঠিক করা হবে?'

অমিতাদি বলেন, 'আজ তো আর কিছু করার নেই। দারোয়ান আর তার বউকে বলে যাচ্ছি, চাঁপা রাত্তিরে এখানে থাকবে। কাল এসেই কিন্তু থানায় চলে যাবে। আশা করি নগেন ওকে যেভাবে মারধোর করেছে, নিজে থেকে আজকেই থানায় যেতে সাহস করবে না।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

অদিতি উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিকাশও উঠে দাঁড়ায়।

অমিতাদি চোখ সরু করে মজার গলায় বলেন, 'অদিতি যথেষ্ট সাবালিকা—সাফিসিয়েণ্টলি অ্যাডাল্ট। ও নিজের সামর্থেই বাড়ি চলে যেতে পারবে। তোমার পৌঁছে না দিলেও চলবে।'

ঘরের অন্য সবাই হাসতে থাকে। অদিতির সঙ্গে বিকাশের সম্পর্ক কতটা গভীর, 'নারী-জাগরণ'-এর প্রতিটি মেম্বার তা জানে।

বিব্রত মুখে বিকাশ বলে, 'না, মানে অদিতির সঙ্গে আমার দরকারী কিছু কথা আছে। তাই—' তার মুখ লাল হয়ে ওঠে।

অমিতাদি হেসে হেসে খানিকটা প্রশ্রয়ের ঢংয়েই বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমাকে আনাড়ি প্রেমিকদের মতো অত লজ্জা পেতে হবে না।'

অদিতি এবং বিকাশ বেরিয়ে পড়ে।

অদিতিরা থাকে বালিগঞ্জের পুরনো পাড়ায়, বিকাশরা ভবানীপুরে।

খানিকটা হাঁটতেই একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পেয়ে যায় দুজনে। ঠিক হয় বিকাশ অদিতিকে তাদের বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে ভবানীপুর চলে যাবে।

ট্যাক্সিতে ওঠার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর হঠাৎ বিকাশ শুরু করে, 'আমি কিন্তু গলফ্ গ্রীনে একটা ফ্ল্যাট বুক করে ফেলেছি। নেক্সট উইকে পজেশান পেয়ে যাব।'

কথাটা এমনই আচমকা, দুম করে বলে ফেলেছে বিকাশ যে বেশ অবাকই হয়ে যায় অদিতি। আসলে চাঁপা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাটা তাকে এতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে অন্য কোনো কিছু ভাবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। চমকটা থিতিয়ে যেতে সে বলে, 'কই, আমাকে আগে কিছু বল নি তো।'

'তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম।'

'কবে বুক করেছিলে?'

'কয়েক মাস আগে।'

'এত টাকা পেলে কোথায়?'

'ভবানীপুরে আমাদের বাড়িতে আর জায়গা হচ্ছিল না। আমার অংশটা দাদাকে লিখে দিলাম। দাদা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নিয়ে আমাকে দিলে। তা ছাড়া কিছু লোনও করতে হয়েছে। তাই দিয়েই—'

বিকাশদের বাড়ির যাবতীয় খবর অদিতির জানা। সে বলে, 'ও—'

বিকাশ অদিতির দিকে একটু ঘুরে বসে প্রচণ্ড উৎসাহে বলতে থাকে, 'জানো ফ্ল্যাটটা দারুণ। থ্রি বেড রুমস, দুটো বাথ, ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল, তিনটে ব্যালকনি। সব মিলিয়ে কার্পেট এরীয়া হাজার স্কোয়ার ফিট। তিনটে দিকে খোলা— সাউথ, ইস্ট, ওয়েস্ট। কবে দেখতে যাবে বল—'

'যাব একদিন—'

'এক-দিন-ট্যাকদিন না, নেক্সট রবিবারই তোমাকে নিয়ে যাব।'

একটু চুপ করে থেকে অদিতি বলে, আচ্ছা—' ফ্ল্যাটের কথায় সে খুশি হয়েছে কিনা বোঝা যায় না।

অদিতি খুবই চাপা ধরনের। বাইরে থেকে তাকে সামান্যই বোঝা যায়, তার স্বভাবের বেশির ভাগটাই গোপন। কখনও, কোনো কারণেই তাকে উচ্ছ্বসিত বা প্রগলভ হতে দেখা যায় না। নিরুচ্ছ্বাস, স্বল্পভাষিণী, অন্তর্মুখী এই মেয়েটাকে অনেক সময় ভারি রহস্যময় আর অচেনা মনে হয় বিকাশের। তবু তার মধ্যে এমন তীব্র, প্রবল, অদম্য এক আকর্ষণ রয়েছে যে তাকে বাদ দিয়ে নিজের অস্তিত্ব অর্থহীন মনে হয়। বিকাশ বলতে থাকে, 'ফ্ল্যাটটা কিন্তু খুব ভাল করে সাজাতে হবে।'

অদিতি উত্তর দেয় না।

বিকাশের উদ্দীপনা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। সে বলে, 'ইন্টেরিয়র ডেকরেটরদের হাতে ছেড়ে দেবো, না নিজেরাই সাজাবো?'

অদিতি বলে, 'তুমি যা ভাল বুঝবে।' বলে জানালার বাইরে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকে।

'জানো, অকশানে দুর্দান্ত সব জিনিস—খাট কার্পেট মিক্সি আলমারি সোফা ক্রকারি—খুব সস্তায় পাওয়া যায়। এ সপ্তাহেই তোমাকে অকশান হাউসগুলোতে নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে।'

প্রথমটা লক্ষ করেনি বিকাশ। নিজের খুশিতেই কথা বসে যাচ্ছিল। গলফ্ গ্রীনের ফ্ল্যাটটা যেন বিরাট অ্যাচিভমেন্ট। কিন্তু হঠাৎ বিকাশের চোখে পড়ে অন্যমনস্কর মতো অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে অদিতি। উচ্ছ্বাসটা থমকে যায় তার। কিছুক্ষণ অদিতির দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'আমার কথা ভাল করে শুনছ না।'

অদিতি জানালার বাইরে থেকে মুখ ফেরায় না। বলে, 'না শুনলে উত্তর দিচ্ছি কী করে?'

'ও তো দায়সারা। কলকাতা শহরে একটা ফ্ল্যাট পাওয়া লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার চেয়েও এক্সাইটিং তা জানো?'

'জানি।'

'আসলে তোমার মাথায় চাঁপার কেসটাই এখনও ঘুরছে। ফর দা টাইম বীয়িং ওটা একধারে সরিয়ে রাখো।'

অদিতি এবার মুখ ফেরায়, সামান্য হাসে, তবু কিছু বলে না।

প্রায় রোজই এই সময়টা ট্রাফিক জ্যাম থাকে। আজ কোথাও বাস মিনিবাস, ট্যাক্সি বা প্রাইভেট কার জট পাকিয়ে সব কিছু অচল করে দেয়নি। মসৃণ গতিতে ট্যাক্সিটা পুরানো বালিগঞ্জে চলে আসে।

বিকাশ বলে, 'ফ্ল্যাট তো হল। সাজাবার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে কিন্তু আসল কাজটাই এখনও হল না। সেটা ছাড়া এইসব ফ্ল্যাট ট্যাট একেবারে মীনিংলেস—' একটু থেমে গাঢ় গলায় এবার বলে, 'ভবানীপুরে ভাঙাচোরা বাড়ি, সেখানে অনেক অসুবিধে ছিল কিন্তু এখানে সেসব ব্যাপার নেই। কিরকম সময় আমরা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে যেতে পারব?'

শেষের এই কথাটা আগে বেশ কয়েক বার বলেছে বিকাশ। তবে এতটা জোর দিয়ে কখনই নয়। অদিতির নিজের দিক থেকে এখনও কিছু দ্বিধা আছে, বাড়ির দিক থেকে বেশ খানিকটা বাধাও। কিন্তু সে সব কথা পরে।

অদিতি বলে, 'আমাকে আরো কিছুদিন ভাবার সময় দাও।'

'অনেক ভেবেছ। আর সময় পাবে না। ফ্ল্যাটটা সাজানো হয়ে গেলে আমি কিন্তু কোনো কথা শুনব না।' বিকাশের গলায় অধীরতা ফুটে বেরোয়।

অদিতি বলে, 'এত অধৈর্য হলে চলে?' ট্যাক্সি তাদের বাড়ির কাছে এসে গিয়েছিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একপলক দেখেই সে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলল, 'সর্দারজি, এখানে একটু থামান।'

শিখ ড্রাইভার ব্রেক কষতেই ঘ্যাস্-স্-স্-করে চাকার ঘষটানির আওয়াজ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি থেমে যায়। দরজা খুলে রাস্তায় নামতে নামতে অদিতি বলে, 'চলি। কাল 'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে আসছ তো? চাঁপাকে নিয়ে থানায় যেতে হবে।'

বিকাশ বলে, 'আসব। আমার কথাটা মনে রেখো। এক মাসের বেশি সময় কিন্তু দিচ্ছি না।'

অদিতি হাসে, উত্তর দেয় না।

ট্যাক্সিটা আর দাঁড়াল না, বিকাশকে নিয়ে চলে গেল।

তারপর কিছুক্ষণ রাস্তার ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে অদিতি। একটা কথা ভেবে তার ভীষণ খারাপ লাগে। প্রায় রোজই তাকে বাড়ির গেট পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে যায় বিকাশ কিন্তু তাকে সে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। কেননা বাড়ির কেউ বিকাশকে একেবারেই পছন্দ করে না। হঠাৎ ওকে তার সঙ্গে আসতে দেখলে বাড়িতে অশান্তি এবং উত্তেজনা এতই বেড়ে যাবে যে অদিতির পক্ষে একটা দিনও ওখানে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

ট্যাক্সিটা অদিতিদের বাড়ি ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে এসে থেমেছিল। এক-সময় অদিতি ঘুরে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।

চার

ছড়ানো কম্পাউন্ডের মাঝখানে অদিতিদের বিশাল তেতলা বাড়ি। লোহার গেটের দুটো পাল্লা অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছিল। জায়গাটা হাট করে খোলা। পাশেই একসময় দারোয়ানদের জন্য একটা ছোট নিচু শেড ছিল। সেটা কবে ভেঙেচুরে গেছে। শুধু তিন দিকের দেয়ালের খানিকটা করে অংশ নোনা ধরা ইঁটের সারি দিয়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে।

গেট পেরিয়ে অদিতি ভেতরে চলে আসে।

এ বাড়িটা ষাট-সত্তর বছর আগে তৈরি করেছিলেন অদিতির ঠাকুর্দা শিবপ্রসাদ ব্যানার্জী। তিনি ছিলেন বৃটিশ আমলের একজন নাম করা স্টিভেডর। জাহাজী ব্যবসাতে প্রচুর টাকা করেছিলেন।

গথিক স্ট্রাক্চারের এই বাড়িটায় বিরাট বিরাট পিলার, চওড়া চওড়া শ্বেত পাথরের সিঁড়ি। মানুষটা ছিলেন দারুণ সৌখিন। মেজাজও ছিল দরাজ। টাকাও যেমন রোজগার করতেন, দু হাতে খরচও করেছেন দেদার। তবে সেগুলো অপব্যয় নয়। দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজন বা অজানা অনাত্মীয় মানুষজনকে প্রচুর সাহায্য করতেন। এই দানধ্যান ঢাক ঢোল পিটিয়ে পাবলিসিটি পাবার জন্য নয়, সবটাই করতেন গোপনে। যাই হোক, খাঁটি বার্মা টীক আর মেহগনির ওপর কারুকাজ-করা ভারী ভারী আসবাব দিয়ে বাড়ি সাজিয়ে-

ছিলেন শিবপ্রসাদ। ড্রেসিং-টেবল আর আলমারির গায়ে যেসব লাইফসাইজ আয়না লাগানো ছিল সেগুলো আনানো হয়েছে ইতালি থেকে। দু হাজার বর্গফিটের প্রকাণ্ড ড্রইং রুমটা ন-ইঞ্চি পুরু কাশ্মিরী কার্পেটে মোড়া থাকত। খাস লণ্ডন থেকে জমকালো আটটা ঝাড়লণ্ঠন আনিয়ে সেখানে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন শিবপ্রসাদ।

দুর্দান্ত বিলিতি আর জার্মান গাড়ি ছিল চার পাঁচটা। চাকরবাকর শোফার কুক ইত্যাদি নিয়ে ডজনখানেক। বাড়ির পেছনে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া নিচু সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্সে তারা থাকত।

এ-সব পুরনো দিনের ইতিহাস, সুখকর অলীক স্মৃতিমাত্র। সেদিনের কথা ভাবলে বুকের অতল স্তর থেকে শুধু দীর্ঘশ্বাসই উঠে আসে।

অদিতির জন্মের অনেক আগেই তাদের পরিবারের গোল্ডেন পীরিয়ড বা স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেছে। বিলিতি গাড়ি, ফার্নিচার, শ্যান্ডেলিয়ার, কার্পেট, গণ্ডা গণ্ডা চাকর-বাকর—এ-সবের কথা সে শুনেছে মা-বাবা পিসিমা কিংবা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের মুখে।

স্বাধীনতার ঠিক দশ বছর বাদে অদিতির জন্ম। জ্ঞান হবার পর থেকে যা দেখে আসছে তা এইরকম।

প্রথমে বাড়িটার কথা ধরা যাক। ঠাকুর্দার আমলে নাকি তিনটে মালী বছরের পর বছর অক্লান্ত খেটে বাড়ির সামনে এবং পেছনে চমৎকার মরশুমী ফুল আর ফলের বাগান আর সবুজ ঘাসের লন বানিয়েছিল। সে-সবের চিহ্নমাত্র নেই। বিশ-পঁচিশ বছর ধরে বাড়িটাকে ঘিরে শুধু আগাছার জঙ্গল। শ্বেত পাথরের সিঁড়ি কোনোটাই প্রায় অক্ষত নেই। পিলার এবং দেয়ালগুলোর গা থেকে পলেস্তারা খসে দগদগে ঘায়ের মতো দেখায়। ছাদের কার্নিস আলসে ভেঙেচুরে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। দেয়াল আর ছাদ ফাটিয়ে নানা জায়গায় অশ্বত্থ গজিয়ে গেছে। ঘুলঘুলিতে বংশ পরম্পরায় পায়রা আর চড়ুইয়েরা তাদের সংসার বাড়িয়ে চলেছে। বাড়িভর্তি ইঁদুর আরশোলা এবং ছুঁচোর রাজত্ব।

স্বাধীনতার পর থেকে এ-বাড়িতে আর রং-টং করানো হয়নি। জানালার রঙিন কাচ বা খড়খড়ি বলতে কিছু নেই। ভাঙা জায়গাগুলোতে চট বা পুরোনো খবরের কাগজ গুঁজে দেওয়া হয়েছে। মোট কথা, বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানিই এগিয়ে আছে। আর বড় জোর কুড়ি-পঁচিশ বছর, তারপর হুড়মুড় করে হয়ত একদিন ভেঙে পড়বে। চার-পাঁচটা দামী গাড়ির একটাও আর নেই। পুরনো আসবাব, কার্পেট, শ্যান্ডেলিয়ার, এ-সব কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গেছে। বার্মা টীকের আসবাবের বদলে ঘরে ঘরে এখন খেলো কাঠের টেবল-চেয়ার তক্তপোষ আলমারি ইত্যাদি। বেশির ভাগ বাঙালি পরিবারের যা হয়, অদিতিদেরও সেই হাল।

তিন, কি বড় জোর চার পুরুষের মধ্যে রমরমা শেষ হয়ে যায়। বড়মানুষি চাল, আদব-কায়দা এবং জৌলুস নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে শুধু অসার বিবর্ণ খোলসটুকু।

নিজেদের বংশলতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই অদিতির। শিবপ্রসাদের আগে তাদের পরিবারের সব ইতিহাসই কুয়াশায় ঢাকা! অর্থাৎ জাঁক করে বলার মতো তখন কিছুই ছিল না। তাদের বংশে যে স্বল্পস্থায়ী সুখের দিন এসেছিল তা একমাত্র শিবপ্রসাদের জন্যই।

শিবপ্রসাদ মারা গেছেন স্বাধীনতার কয়েক মাস আগে। তারপর চুয়াল্লিশ বছর কাটতে না কাটতেই মাত্র দুটো জেনারেশনের মধ্যে বাড়িটার হাল কেন এরকম হয়ে গেল সেটা বুঝতে হলে অদিতির বাবা এবং দাদাদের জীবনচরিত জানা একান্ত জরুরি। কিন্তু সে সব কথা পরে।

গেট দিয়ে ঢুকলেই এবড়ো-খেবড়ো খোয়ার রাস্তা। অদিতির ছেলেবেলায় এই পথটাতে বাদামী রঙের নুড়ি বিছানো থাকত। তারপর কবে যে নুড়ি-গুলো উধাও হয়ে তার জায়গায় খোয়া ফেলা হয়েছিল, এখন আর মনে পড়ে না।

দুধারে আগাছার ঝাড়। পুরনো দিনের সুখস্মৃতির মতো মাঝে মধ্যে দু-একটা সিলভার পাম এখনও কোনোরকমে টিকে আছে।

কমপাউণ্ডের ভেতর চার-পাঁচটা ল্যাম্পপোস্ট রয়েছে। কিন্তু ইলেকট্রিকের খরচ বাঁচাতে আট-দশ বছর ধরে আলো জ্বালানো হয় না! ফলে এই সন্ধে-বেলাতেই চারিদিকে ঝুপসি অন্ধকার। আলোর ছুঁচের মতো সেই অন্ধকারকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে অগুনতি জোনাকি উড়ছে। সিলভার পামের মাথা থেকে পাখিদের ডাকাডাকি আর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ ভেসে আসছে।

অন্যমনস্কের মতো খোয়া মাড়িয়ে মাড়িয়ে বাড়ির সামনে এসে পড়ে অদিতি। দশটা শ্বেত পাথরের ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেই বিশাল লাউঞ্জ।

লাউঞ্জ পেরিয়ে বিরাট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই চওড়া প্যাসেজ। সেটার বাঁ-দিকে বিশাল ড্রইং রুম, ডান দিকে ওপরে সিঁড়ি। দু-ধারে বসার ঘর আর সিঁড়ি রেখে প্যাসেজটা সোজা বাড়ির পেছন দিকে চলে গেছে। সেখানে কিচেন, স্টোর, ডাইনিং-রুম। যে দু-একটি কাজের লোক এখনও রয়েছে, তারা ওখানেই থাকে।

প্যাসেজে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সবাই বোধহয় দোতলায় কি তেতলায়। শুধু একটা কম পাওয়ারের টিমটিমে আলো জ্বলছে এখানে।

প্যাসেজে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অদিতি। নিজের অজান্তেই তার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে।

অদিতি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ড্রইং রুমটা খুব বেশি হলে সাত আট ফিট দূরে। ঘরের ভেতর দুই দেয়ালে দুটো জোরালো টিউব ল্যাম্প জ্বলছে।

অদিতি দেখতে পায়, বেতের সোফায় তেলচিটে গদির ওপর বসে আছে সিতাংশু—সিতাংশু ভৌমিক। তার মুখোমুখি দুই দাদা—বরুণ আর মৃগাঙ্ক। পাশের একটা শোফায় কাত হয়ে আছেন রমাপ্রসাদ। রমাপ্রসাদ ব্যানার্জী অদিতির বাবা। রমাপ্রসাদের আর্থরাইটিসের কষ্টটা আজ নিশ্চয়ই খুব বেড়েছে, নইলে ওভাবে আড় হয়ে থাকতেন না।

সিতাংশু হাত-টাত নেড়ে ভারিক্কি চালে বাবা আর দাদাদের কী যেন বোঝাচ্ছে। আর মুগ্ধ শ্রোতার মতো কৃতার্থ ভঙ্গিতে ওরা তিনজন তার কথা শুনছে।

কেন বাবা আজ দুপুরে বেরুবার সময় বার বার সন্ধের আগে তাকে বাড়ি ফিরতে বলেছিলেন, এতক্ষণে বুঝতে পারে অদিতি। সে যে সিতাংশুকে একেবারেই পছন্দ করে না, তাকে দেখামাত্র অদিতির কমস্ত মন যে বিরূপতায় ভরে যায় সেটা বাবার ভাল করেই জানা আছে। তাই দুপুরে সে যখন বেরোয়, ঘুণাক্ষরেও জানাননি, আজ সিতাংশু আসবে। জানালে সে কিছুতেই এখন ফিরত না।

সিতাংশু যে তার জন্য সেই বিকেল থেকে ঝাড়া দু-তিন ঘণ্টা বসে আছে, এ ব্যাপারে অদিতি পুরোপুরি নিশ্চিত। লোকটার অসীম ধৈর্য। ধৈর্যের মূর্তিমান সিম্বলই তাকে বলা যায়।

সিতাংশুকে দেখতে দেখতে অদম্য ক্রোধ অদিতিকে পেয়ে বসে। মাথায় প্রবল রক্তচাপ টের পায় সে। একটি চড় মেরে লোকটাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে কিনা যখন ভাবছে, সেই সময় হঠাৎ রমাপ্রসাদ তাকে দেখতে পান। কাত করা শরীরটা টেনে হিঁচড়ে খাড়া করতে করতে ব্যস্তভাবে বলেন, 'বুবু তুই! ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভেতরে আয়।' অদিতির ডাক নাম বুবু।

অদিতি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, আচমকা তার চোখে পড়ে একটু দূরে সিঁড়ির মুখে তাদের কাজের মেয়ে দুর্গা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় তাকে ডাকছে। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে যায় সে।

ড্রইং রুম থেকে রমাপ্রসাদের অসহিষ্ণু গলা ভেসে আসে, 'কী হল রে, কোথায় যাচ্ছিস? এখানে এলি না?'

'একটু পরে আসছি।'

দুর্গার কাছাকাছি আসতেই চাপা গলায় সে বলে, 'পিসিমা তোমাকে এক্ষুনি একবার ওপরে যেতে বলেছে ছোটদি।'

দুর্গার বয়েস সতের আঠার। কালো সুশ্রী চেহারা। মেয়েটা অদিতির খুবই অনুগত।

অদিতি রীতিমত অবাকই হল। সে যে এই মুহূর্তে ফিরে আসবে, তেতলার ঘরে শুয়ে শুয়ে পিসিমা কী করে টের পেলেন, কে জানে! জিজ্ঞেস করল, 'কেন রে?'

দুর্গা বলল, 'ঠিক জানি না। তবে—' বলতে বলতে সে চুপ করে যায়।

দুর্গার দিকে চোখ রেখে একটু ভেবে অদিতি বলে, 'তুই পিসিমাকে গিয়ে বল, বাবা দাদারা আর এক ভদ্রলোক আমার জন্যে অপেক্ষা করেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে ওপরে যাচ্ছি।'

'সিতাংশুবাবু এসেচে তো?'

অদিতি চমকে ওঠে। দুর্গা এমনিতে খুবই চালাক চতুর। তার দুটোর জায়গায় দশটা চোখ, দশটা কান। তার চোখ-কান এড়িয়ে এ বাড়িতে কিছু হবার উপায় নেই। বোঝা গেল, সিতাংশু যে কিছুদিন ধরে এখানে হানা দিচ্ছে, দুর্গা তা জানে। কোন উদ্দেশ্যে সিতাংশুর যাতায়াত, সেটাও হয়ত তার অজানা নেই।

অদিতি বলে, 'হ্যাঁ। তুই সিতাংশুবাবুকে চিনলি কী করে?'

চোখ দুটো চিকচিকিয়ে ওঠে দুর্গার। ঠোঁট কুঁচকে মজার একটা ভঙ্গি করে বলে, 'বা রে, চিনব না! তিন মাস ধরে সকাল নেই বিকেল নেই আসচে তো আসচেই। বড়বাবু আর দাদাবাবুদের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে গুজুর-গুজুর কী পরামর্শ যে করে!'

অদিতি চমকে ওঠে। এ খবরটা নতুন এবং খানিকটা চাঞ্চল্যকরও। অদিতির ধারণা ছিল তিন চার বারের বেশি এ বাড়িতে আসেনি সিতাংশু। কিন্তু দুর্গা যা বলছে তাতে মনে হয় নিয়মিতই সে হাজিরা দিচ্ছে।

অদিতি জিজ্ঞেস করল, 'আমি যখন থাকি না তখনও আসে?'

'তখনই তো বেশি আসে গো ছোটদি।'

'তুই আমাকে বলিসনি তো!'

'তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েচ?'

দুর্গার স্বভাবই হল, গায়ে পড়ে কোনো কথা বলে না। সে শুধু দেখে আর শুনে যায়। অদিতি এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করে না।

অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'আজ কখন এসেছে?'

গালে হাত দিয়ে খানিক ভাবে দুর্গা। তারপর বলে, 'সেই দুপুরের এট্টু পর থিকে। ধর গে তখন তিনটে চারটে হবে।'

এটাই আন্দাজ করেছিল অদিতি। সে বলে, 'এতক্ষণ ধরে বাবা আর দাদাদের সঙ্গে কথা বলছে!'

'বড়বাবু আর বড় দাদাবাবু বাড়িতেই ছিলেন। তাঁরা নাগাড়ে কথা বলেছেন। এই খানিক আগে এলেন ছোটদাবাবু। তিনিও আর ওপরে যাননি। ওঁদের সঙ্গেই বসে গেচেন।' দুর্গাদের আদি বাড়ি সুন্দরবনের

কাছাকাছি একটা অজ গাঁয়ে। আগে দেশের ভাষায় গেঁয়ো টানে কথাবার্তা বলত। অনেক দিন কলকাতায় থেকে তার কথায় এবং আচারে ব্যবহারে অনেকটা শহুরে পালিশ এসে গেছে।

অদিতি বলে, 'এত কী কথা বলছে ওরা, এতক্ষণ ধরে?'

'তা কী করে বলব! মনে হয় তোমার সম্বন্ধেই কী সব বলছিল। আর কী খাতির! চা করে দিলাম পাঁচ বার, সেই সঙ্গে তালশাঁস সন্দেশ, কাজু বরফি ছানার মুড়কি।'

অদিতি উত্তর দেয় না।

দুর্গা এবার তাড়া লাগায়, 'ওপরে চল ছোটদি। পিসিমা বলে দিয়েচে বড়বাবু, সিতাংশুবাবু আর দাদাবাবুদের সঙ্গে কথা কইবার আগে তেনার সঙ্গে দেখা করতে। খুব দরকার।'

'আচ্ছা চল—'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে দোতলার বড় বারান্দায় হেমলতাকে দেখতে পায় অদিতি। হেমলতা তার মা। রোগা পাতলা চেহারা। এক-সময় দুর্দান্ত সুন্দরী ছিলেন। এখন টকটকে রং জ্বলে গেছে। চোখের কোলে কালির ছোপ। মুখটা ভেঙেচুরে কণ্ঠা আর গালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। চুল উঠে উঠে কপালটা চওড়া মাঠের মতো দেখায়। হাতের দিকে তাকালে ফর্সা কোঁচকানো চামড়ার তলায় নীল শিরাগুলি দেখা যায়। শরীরে সারাংশ বলতে বিশেষ কিছুই নেই। চারিদিকে শুধু ধ্বংসের ছাপ।

হেমলতা একটা আধ-ছেঁড়া মোড়ায় বসে খানিকটা ঝুঁকে কি যেন সেলাই করছিলেন। গোল বাই-ফোকাল চশমাটা নাকের নিচের দিকে অনেকটা নেমে এসেছে। পায়ের শব্দে মুখ তুললেন। সিঁড়িতে অদিতিকে দেখতে পেয়ে আবছা মৃদু গলায় বললেন, 'এই ফিরলি বুবু?' তাঁর কণ্ঠস্বর এর বেশি কখনই ওঠে না।

অদিতি থেমে যায়। বলে, 'হ্যাঁ, মা—'

'সিতাংশু এসেছে।'

'দেখেছি।'

'তোর বাবা, রাজা আর ব্যবলু তাকে নিয়ে বাইরের ঘরে বসে ছিল।' রাজা এবং বাবলু—বরুণ আর মৃগাঙ্কর ডাক নাম। অদিতি বলে, 'ওরা এখনও বসে আছে।'

'ওদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে?'

'না। আগে পিসিমার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

ভয়ে ভয়ে হেমলতা বলেন, 'ওদের সঙ্গে কথা বলে এলেই পারতিস।'

সেই ছেলেবেলা থেকে অদিতি দেখে আসছে মা সারাক্ষণ শঙ্কিত এবং তটস্থ হয়ে থাকেন। গলা চড়িয়ে তাঁকে কেউ কোনদিন কথা বলতে শোনেনি।

এ বাড়িতে তিনি যে আছেন সেটা প্রায় বোঝাই যায় না। নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে নিঃশব্দে ছায়ার মতো চলাফেরা করেন। সবসময় কী একটা অজানা দুর্বোধ্য ভয় তাঁকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে।

'অত ভেবো না মা। দশ মিনিট পরে ওখানে গেলে এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ হয়ে যাবে না।'

'যা ভাল বুঝিস কর। পরে যেন এ নিয়ে আবার অশান্তি না হয়।'

অদিতি বলে, 'অশান্তি হবেই মা। ভেবে ভেবে তুমি মাথা খারাপ করে ফেললেও ওটা কেউ ঠেকাতে পারবে না।' বলে সে আর দাঁড়ায় না। দ্রুত সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তেতলায় উঠতে থাকে।

হেমলতার স্বভাবটি ভারি মৃদু। তিনি চিরকালই নরম ধাতের মানুষ। কোনোরকম উত্তেজনার কারণ ঘটলে তিনি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। হেমলতা চান নির্ঝঞ্ঝাটে, বিনা সমস্যায় দিন কাটিয়ে দিতে কিন্তু সেই একান্ত কাম্য জীবনটি কে তার হাতে তুলে দিচ্ছে? এ বাড়িতে শান্তি নেই। সর্বক্ষণ একটা না একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেই চলেছে।

হেমলতা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁর চোখেমুখে উদ্বেগ ফুটে বেরোয়। ব্যাকুল স্বরে ডাকেন, 'বুবু—বুবু—'

অদিতি থামে না। ওপরে উঠতে উঠতে মুখ ফিরিয়ে একবার তাকায়, 'কী বলছ?'

'কোনো গোলমাল করিস না মা। আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।' হেমলতার কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে।

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা, আমি নিজের থেকে গোলমাল করব না। আমাকে তো জানো, অশান্তি আমিও পছন্দ করি না। তবে আমার ওপর কেউ যদি অন্যায়ভাবে জুলুম করে, সেটা কিছুতেই মেনে নেবো না।'

হেমলতার উৎকণ্ঠা তাতে কাটে না। মেয়েকে তিনি ভালই চেনেন। তাই ভয়টা বেড়েই যায়। কাঁপা গলায় বলেন, 'শোন বুবু—আমার আরেকটা কথা শুনে যা—'

অদিতি মায়ের গলা শুনতে পায় কিনা বোঝা যায় না। তেতলায় উঠে সোজা কোণের দিকের একটা ঘরে চলে যায়।

একধারে দেওয়াল ঘেঁষে একটা তক্তাপোষে শুয়ে আছেন মৃণালিনী। ঘরের মাঝখানে একটা বাল্ব মিটমিট করে জ্বলছে। এধারে ওধারে দু-তিনটে পাল্লা-ভাঙা আলমারি। উল্টোদিকের অন্য একটা দেয়ালে গোল আয়না, সেটার তলায় কাঠের তাকে চিরুনি, চুলের কাঁটা, একটা খেলো পাউডারের কৌটো, নেইল-কাটার ইত্যাদি। বর্ষার জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে সিলিং এবং দেয়ালে কালচে কালচে দাগ ধরে আছে। সিলিং থেকে পলেস্তারা খসে খসে ভেতরকার লোহার ফ্রেম বেরিয়ে পড়েছে।

মৃণালিনীর বয়স পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। বাঙালীদের তুলনায় তাঁর হাইট রীতিমত ভালই—পাঁচ ফিট সাত আট ইঞ্চির মতো। চওড়া চওড়া হাড়ের ফ্রেমে একসময় দুর্দান্ত স্বাস্থ্য ছিল তাঁর। খুবই সুন্দরী ছিলেন যৌবনে। হেমলতাও অসাধারণ রূপসী। কিন্তু দুজনের রূপ দুই ধরনের। হেমলতার দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে থাকত ভীরুতা। কিন্তু মৃণালিনীকে ঘিরে যা ছিল তা দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্ব। এমন তেজী অনমনীয় জেদী মহিলা খুব বেশি দেখেনি অদিতি। যদি কিছু তিনি ঠিক করে ফেলেন সেই সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে টলানো প্রায় অসম্ভব।

অবশ্য এই পঁয়ষট্টি ছেষট্টি বছর বয়সে রূপ এবং স্বাস্থ্যের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। হেমলতার মতোই তাঁর সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। তার ওপর পাঁচ বছর ধরে পক্ষাঘাতে বাঁ দিকটা পড়ে গেছে। হেমলতা তবু চলে ফিরে বেড়ান, সংসারের টুকিটাকি নানা কাজকর্ম করেন। মৃণালিনীর সে সামর্থটুকুও নেই। আমৃত্যু তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হবে। এই অবস্থাতেও তাঁর দাপট বিন্দুমাত্র কমেনি।

মৃণালিনী বলেন, 'আমার কাছে আয়।'

অদিতি এগিয়ে গিয়ে মৃণালিনীর পাশে বসে পড়ে বলে, 'আমি যে এখন আসব, জানলে কী করে?'

'দুর্গাকে জানালার কাছে বসিয়ে রেখেছিলাম। তোকে দেখলেই যেন ধরে নিয়ে আসে।'

'কেন?'

'তোর বাবা, রাজা, বাবলু আর সেই লোকটা—কী যেন নাম?'

'সিতাংশু ভৌমিক।'

'হ্যাঁ সিতাংশু। ওদের হাতে পড়ার আগে তোকে অনেক কথা জানাবার আছে।'

'বল।'

'স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তোর বাবা আর ভাইরা তোকে সিতাংশুর সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। তবে এটাকে বিয়ে বলে না।'

রমাপ্রসাদ, বরুণ আর মৃগাঙ্ক তার বিয়ে যে সিতাংশুর সঙ্গে দিতে চায় সেটা অনেক আগেই টের পেয়েছে অদিতি। কিন্তু এর সঙ্গে তাদের স্বার্থসিদ্ধির কী সম্পর্ক, বোঝা যাচ্ছে না। বিমূঢ়ের মতো সে বলে, 'বিয়ে বলে না!'

'না।'

'তাহলে এটা কী?'

মৃণালিনীর শরীরের যে অংশটা সুস্থ, সেখানে কোনো অদৃশ্য বৈদ্যুতিক প্রবাহ খেলে যায়। প্রবল উত্তেজনায় সে দিকটা কাঁপতে থাকে। বাঁ হাত

তুলে তিনি বলেন, 'তোকে ওরা বেচে দিতে চায়।'

এবার হকচকিয়ে যায় অদিতি। তার চোখে দুর্ভাবনার ছাপ ফুটে বেরোয়। অন্য কেউ কথাটা বললে সে একটু হেসে উড়িয়ে দিতে পারত কিন্তু পিসিমা সব না জেনে, না ভেবেচিন্তে কিছুই বলেন না। অদিতি চোখ কুঁচকে বলে, 'মানে ?'

'কিছুই কি তুই টের পাসনি বুবু ?'

'কী টের পাব ?'

'আশ্চর্য, আমি এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব জানতে পারি আর তোর যে এতবড় সর্বনাশ হতে যাচ্ছে সে খবরটুকুও রাখিস না !' বলে একটু থামেন মৃণালিনী। পরক্ষণেই তীব্র গলায় আবার শুরু করেন, 'তোর বাপ আর দাদারা ওই লোকটার কাছ থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা ধার নিয়েছে। সে সব শোধ করার ক্ষমতা এ জন্মে ওদের হবে না। এদিকে সিতাংশুর নজর পড়েছে তোর ওপর। বিয়ে হলে টাকাটা আর ফেরত দিতে হবে না। অমানুষ— অমানুষ। এ বংশে এরকম কুলাঙ্গার জন্তু জন্মাবে, কে জানতো !'

বাবা আর দাদারা যে এতটা নিচে নেমে গেছে, পয়সার জন্য তলায় তলায় এমন জঘন্য মতলব এঁটে বসে আছে, ভাবতে পারেনি অদিতি। সিতাংশুর এত ঘন ঘন এবাড়িতে হানা দেবার কারণটা এবার বোঝা যাচ্ছে। পক্ষাঘাতে-অসাড় মানুষের মতো সে বসে থাকে।

মৃণালিনী বলেন, 'নারী-জাগরণ' 'নারী-জাগরণ' করে তো খাওয়া-দাওয়া ঘুম-বিশ্রাম সব প্রায় ছেড়েছিস, দিন রাত সারা শহর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিস কিন্তু নিজের জাগরণটা কবে হবে ?'

অদিতি আস্তে আস্তে মৃণালিনীর দিকে তাকায়। তবে কোনো উত্তর দেয় না।

মৃণালিনী সস্নেহে তাঁর ডান হাতটা অদিতির কাঁধে রেখে বলেন, 'ভয় পাস না আমি তোর পেছনে আছি।'

বাবা আর দাদাদের নীচতা আর গোপন ষড়যন্ত্র অদিতিকে প্রচণ্ড কষ্ট দিচ্ছিল। মৃণালিনী একটু আগে যা বললেন সেই কথাগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে ভাবছে। নিজের সম্বন্ধে অদিতির ধারণা নারী স্বাধীনতা এবং মেয়েদের অসংখ্য সমস্যার ব্যাপারে সে একজন ধর্মযোদ্ধা। এই শহরে যেখানেই বধূ হত্যা, নারী নির্যাতন বা মেয়েদের ওপর আক্রমণ সেখানেই অদিতি। মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা এবং নিরাপত্তার কারণে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে চলেছে। অথচ তাকেই যে বিক্রি করে দেবার চক্রান্ত চলছে সে খবরটা পর্যন্ত সে রাখে না। অদিতি নিজে একজন অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত তরুণী, আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট স্বাবলম্বী। একটি কলেজে সে পড়ায়। সামাজিক মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝায় সে

সবই তার আছে। তার মতো একটি মেয়ের স্বাধীনতা যেখানে বিপন্ন সেখানে তার চেয়ে অনেক নিচের স্তরের অশিক্ষিত এবং আর্থিক দিক থেকে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল মেয়েদের জন্য সে কতটুকু কী করতে পারে? হঠাৎ অদ্ভুত এক নৈরাশ্য চারিদিক থেকে তাকে যেন ঘিরে ধরতে থাকে।

মৃণালিনী এবার বলেন, 'তোর বাপ আর ভাইরা যেন মনে রাখে আমি এখনও মরে যাইনি। যতক্ষণ বেঁচে আছি তোর ক্ষতি আমি করতে দেবো না। প্যারালিসিসে পড়ে থাকলেও ওরা আমাকে এখনও ভয় পায়।'

অদিতি উত্তর না দিয়ে দূরমনস্কর মতো বসে থাকে।

মৃণালিনী বলেন, 'তবে একটা কথা বলব—'

অদিতি অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

মৃণালিনী বলেন, 'নিজেকে খুব শক্ত রাখবি। ওদের কথায় একেবারে রাজী হবি না। আমাদের পরিবারে দুটো দুর্ঘটনা ঘটেছে। তৃতীয় বার আর যেন না ঘটে। তোর মনের জোর থাকলে আমি অন্তত ঘটতে দেবো না।'

মৃণালিনীর মতো মহিলা এই সামাজিক সিস্টেমে ক্বচিৎ কখনও দেখা যায়। পক্ষাঘাতে একটা দিক পড়ে গেছে, দশ বছর একটানা শয্যাশায়ী হয়ে আছেন কিন্তু এখনও মনের দৃঢ়তা তাঁর অপরিসীম। তাঁর মধ্যে একটি অপরাজেয় শক্তি আছে, কোনো কারণেই সেটা মাথা নোয়াতে জানে না।

দুটি পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা যে মৃণালিনী বলেছেন তার একটি ঘটেছে মৃণালিনীর জীবনে, অন্যটি সুজাতার। সুজাতা অদিতির ছোটদি।

প্রথমে মৃণালিনীর কথাই ধরা যাক। এক দারুণ ছাত্রী ছিলেন মৃণালিনী। সতের বছর বয়সে স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। তারপরেই ঠাকুর্দা তাঁর বিয়ে দেন। মৃণালিনী আরও পড়াশুনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রচুর পয়সা করলেও এ বাড়ির আবহাওয়ায় বহুকালের প্রাচীন সংস্কার শিকড় গেড়ে ছিল। পনেরো পেরুবার আগেই এই বংশের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। সেদিক থেকে বয়স দুবছর বেশি হয়ে গিয়েছিল মৃণালিনীর। বিয়েটা আটকাবার জন্য প্রচুর কান্নাকাটি করেছেন তিনি, পুরো তিনটে দিন প্রতিবাদ হিসেবে কিচ্ছু খাননি। কিন্তু শিবপ্রসাদকে টলানো যায়নি। মেয়ের জন্য পারিবারিক প্রথা তিনি পুরোপুরি ভাঙতে পারেন না। যেটুকু পড়াশোনা হয়েছে যথেষ্ট। ঠাকুর্দার মতে এর বেশি দরকার নেই। তাঁর এবং এ বাড়ির মানুষজনের ধারণা, মেয়েরা গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারবে, রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারবে—এটুকু হলেই জীবন কেটে যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত লেখা-পড়া মেয়েদের মধ্যে জেদ এবং ব্যক্তিত্ব এনে দেয়। তারা প্রতিবাদ করতে শেখে। সেটা সাংসারিক শান্তির পক্ষে ক্ষতিকর। মেয়ের কান্নায় বিচলিত হয়ে চালু নিয়মের বাইরে পা রাখার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না।

বিয়ে হয়েছিল এক বনেদি অভিজাত পরিবারে। পৃথিবীতে কাম্য বস্তু বলতে তাদের যদি কিছু থাকে তা হল অর্থ। নিজেদের কোনোরকম অভাব ছিল না। গোটাচারেক বাড়ি, তিন চারটে গাড়ি, ওয়েলার ঘোড়ায় টানা ল্যাণ্ডো ইত্যাদি। তাছাড়া ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটে অজস্র অর্থ, নানা কোম্পানিতে আট দশ লাখ টাকার শেয়ার। তবু তাদের খাঁই মিটত না। এইসব টাকার বেশির ভাগ এসেছে ছেলেদের বিয়ের যৌতুক হিসেবে। মৃণালিনীর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বিয়েটাকে টাকা বানাবার একটা কৌশল হিসেবে ব্যবহার করত। বেছে বেছে এমন সব বাড়ি থেকে পুত্রবধু জোগাড় করত যাদের প্রচুর অর্থ, বিপুল প্রপার্টি।

মৃণালিনীর বিয়ের সময় তাঁর শ্বশুরেরা যৌতুক এবং নগদ টাকা যা আদায় করার তা তো করেছিলই. মাসখানেক পর থেকে আরও টাকা আনার জন্য মৃণালিণীর ওপর চাপ দেওয়া শুরু হয়েছিল। প্রথম প্রথম শাশুড়ি তাঁকে টাকার কথা বলত. মৃণালিনী শুনতেন কিন্তু উত্তর দিতেন না। পরে শ্বশুর বলতে শুরু করেছিল। অন্য পুত্রবধূরা যে কত ভাল এবং তাদের বাপের বাড়ি থেকে কতভাবে কত টাকা নিয়ে এসেছে নাটকীয় ভঙ্গিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে বলত, শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে মেয়েদের সর্বস্ব এবং সব মেয়েরেই কর্তব্য সেখানকার বিষয়-সম্পত্তি আর টাকা পয়সা অনবরত বাড়িয়ে চলা। মৃণালিনীর স্বামীরও এ ব্যাপারে পুরোপুরি সায় ছিল।

মৃণালিনী আগে জানতেন না, পরে শুনেছেন তাঁর শ্বশুর-বাড়িতে বধূ-হত্যার দু-একটি দৃষ্টান্ত আছে। যে পুত্রবধূরা বাপের বাড়ি থেকে নতুন করে টাকা আনতে রাজী হননি বা এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছে তাদের অকালে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। একেবারে খুনীর বংশ। পয়সার জন্য এরা না পারে এমন কোনো কাজ নেই। তাঁর বাবা খোঁজখবর না নিয়ে এমন একটা বাড়িতে কেন বিয়ে দিয়েছিলেন ভেবে তাঁর ওপর মৃণালিনীর যত না অভিমান হয়েছিল তার চেয়ে বেশি হয়েছে রাগ।

দু-চার বার শ্বশুর শাশুড়ির কাছে টাকার কথা শোনার পর মৃণালিনী মনস্থির করে ফেলেছিলেন। একদিন শ্বশুরকে বলেছিলেন, 'আপনি আমাকে নিয়ে বাবার কাছে চলুন।'

শ্বশুরের চোখমুখ লোভে চকচকিয়ে উঠেছিল। সে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করেনি। তৎক্ষণাৎ চুনোট-করা ধাক্কাপাড় কাচি ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি পরে পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা লাগিয়ে মাথায় পরিপাটি তেড়িটি কেটে মৃণালিনীকে নিয়ে ফীটনে উঠেছিলেন।

ওল্ড বালিগঞ্জে নিজেদের বাড়ি এসে শ্বশুরকে ড্রইংরুমে বসিয়ে বাবা, দাদা এবং মাকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন মৃণালিনী। শান্ত গলায় বাবাকে বলেছিলেন, 'এবার তোমাকে একটা কাজ করতে হবে বাবা।'

শিবপ্রসাদ বেশ অবাক হয়ে গেছেন। বলেছেন, 'কী?'

'কাজটা কিন্তু খুব অপ্রীতিকর।'

'মানে।' শিবপ্রসাদকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন। বলেছেন, 'তোর কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মৃণালিনী উত্তেজনাহীন সুরে বলেছেন, 'এবার পারবে। থানার অফিসার-ইন-চার্জকে খবর দাও, এখনই যেন চলে আসেন।'

সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। শিবপ্রসাদ বিমূঢ়ের মতো বলেছিলেন, 'থানার অফিসার এখানে এসে কী করবে? কী হয়েছে পরিষ্কার করে বল।'

শ্বশুরকে দেখিয়ে মৃণালিনী বলেছিলেন, 'এই লোকটার নামে আমি একটা ডায়েরি করব।'

মা বাবা দাদা, এমন কি মৃণালিনীর শ্বশুর পর্যন্ত আঁতকে উঠেছিল। মা বলেছিলেন, 'কার সম্বন্ধে কী বলছিস মিনু! তোর কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে!'

'মাথা আমার ঠিকই আছে মা। তোমরা ভাল করে খোঁজখবর না নিয়ে খুনীদের বাড়িতে আমার বিয়ে দিয়েছিলে। পয়সার জন্যে এরা না পারে এমন কাজ নেই।'

শিবপ্রসাদ ধমকে উঠেছিলেন, 'মিনু!'

মৃণালিনী বলেছিলেন, 'আমার সব কথা আগে শুনে নাও। এরা আমার বিয়ের সময় তোমার কাছ থেকে এক লাখ টাকা আদায় করেছিল। এখন আবার পঞ্চাশ হাজার চাইছে। আর সেই টাকাটা নেবার জন্যেই আমাকে নিয়ে এখানে এসেছে। তোমরা যদি না দাও আমার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। ঠিক এই কারণে তিন চারটি বউকে এরা খুন করেছে। এবার আমার পালা। কী করবে, অন্যায়ের সঙ্গে আপস? তা না হলে আমার মৃত্যু অনিবার্য।'

ভয়ে মৃণালিণীর শ্বশুরের মুখ প্রথমটা একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই অসহ্য রাগে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠেছিল, 'এই অপমানের কথা আমার মনে থাকবে।'

মৃণালিনী বলেছিলেন, 'মনে থাকাটা খুব দরকার।'

শ্বশুর আর দাঁড়ায়নি, দাঁতে দাঁত চেপে বেরিয়ে গিয়েছিল।

শিবপ্রসাদ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন। তারপর বলেছেন, 'এ তুই কী করলি মিনু! পঞ্চাশ হাজার টাকা না হয় আমি দিতাম।'

'কিছুতেই না। এই অন্যায়কে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। আজ পঞ্চাশ হাজার দিয়ে তুমি রেহাই পাবে ভেবেছ! কালই আবার এক লাখ চেয়ে বসবে। ওদের লোভের শেষ নেই। আমাকে সামনে রেখে তোমার সমস্ত রক্ত ওরা শুষে নেবে।'

'কিন্তু যে কাণ্ড তুই করলি তাতে শ্বশুরবাড়ির দরজা তো চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।'

'আমি সেটাই চাই। ওইরকম পশুদের বাড়ি আমি কখনই যাব না।'

'পাগলামি করিস না। আমি তোর শ্বশুরমশাইর কাছে ক্ষমা চেয়ে বরং—'

'একেবারেই না বাবা।' তীব্র গলায় মৃণালিনী বলেছিলেন, 'একটা ইতর শয়তানের কাছে তুমি হাতজোড় করে গিয়ে দাঁড়াবে, এ আমি ভাবতেই পারি না।'

শিবপ্রসাদ একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসে থেকেছেন। মা এবং দাদাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কী করবেন, কী বলবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না। দিশেহারার মতো একবার শিবপ্রসাদ, আর একবার মৃণালিণীর দিকে তাকাচ্ছিলেন।

একসময় মুখ থেকে হাত সরিয়ে শিবপ্রসাদ বিভ্রান্তের মতো বলেছেন, 'কিন্তু তোর ভবিষ্যৎ?'

'সেটা আমি ভেবে রেখেছি। পরে তোমাকে বলব। তার আগে দরকারী কাজটা সেরে নিতে হবে।'

'কী?'

'ওরা ঝঞ্ঝাট বাধাবার আগে থানায় চল।'

সেদিনই শিবপ্রসাদ এবং রমাপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়ে শ্বশুরবাড়ির নামে একটা ডায়েরি করেছিলেন মৃণালিনী। পরের দিন থেকে নতুন করে তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়েছিল।

শিবপ্রসাদ বেঁচে থাকতে থাকতেই মৃণালিনী এম. এ পাশ করে একটা স্কুলে চাকরি নিয়েছিলেন। এতে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন শিবপ্রসাদ। মেয়েদের সম্পর্কে এই পরিবারের ধ্যানধারণার সঙ্গে চাকরিটা একেবারেই খাপ খায় না। তারা থাকবে অন্দরমহলে. পরপুরুষের চোখের আড়ালে। হারেমের মতো কড়াকড়ি না থাকলেও মেয়েদের হুটহাট বাইরে যাওয়াটা কেউ পছন্দ করত না। সে আমলে সেটা খুব নিন্দারও ছিল। রক্ষণশীলতার শিকড় এ বাড়ির ভিত পর্যন্ত ঢুকে ছিল। জেদ করে মৃণালিনী লেখাপড়া শিখেছেন, সেটা পরিস্থিতি অনুযায়ী না হয় মেনে নেওয়া যায়। বিবাহিত জীবনটা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল, কিছু একটা নিয়ে তো থাকা চাই। কিন্তু তাই বলে মেয়েরা পয়সা রোজগারের জন্য বাইরে বেরুবে, এটা ছিল একেবারে অভাবনীয়। ক্ষুব্ধ শিবপ্রসাদ বলেছিলেন, 'আমি কি তোকে দুবেলা দুটো খেতে দিতে পারি না?'

মৃণালিনী বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই পার। তুমি যতদিন আছ ততদিন ঠিক আছে। তারপর?'

রমাপ্রসাদ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'আমার ওপর তোর কি বিশ্বাস নেই মিনু?' তাঁর চোখেমুখে অভিমান এবং কষ্টের ছাপ ফুটে উঠেছে।

মৃণালিনী বলেছেন, 'কাউকেই আমি অবিশ্বাস করি না দাদা। এম. এ পাশ করে চুপচাপ ঘরে বসে থাকার মানে হয় না। সারা জীবন এভাবে কাটতে পারে না। কিছু একটা করা ভাল।'

শিবপ্রসাদ কুণ্ঠিত মুখে বলেছিলেন, 'আমি একটা কথা ভাবছিলাম।'

মৃণালিনী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী?'

'আবার যদি তোর বিয়ে দিই?'

মেয়েদের ব্যাপারে এ বাড়ির লোকেরা বিয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। সেটাই যেন তাদের পক্ষে ভবিষ্যতের একমাত্র গ্যারান্টি। সেই যে মৃণালিনীর শ্বশুর উত্তেজিত ভঙ্গিতে চলে গিয়েছিল, তার কয়েক দিন বাদেই চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে, মৃণালিনীর সঙ্গে তাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই, তাঁর কাছে শ্বশুরবাড়ির দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

অসাধারণ মনের জোর ছিল মৃণালিনীর, সেই সঙ্গে চরিত্রের দৃঢ়তা। তা ছাড়া সবরকম সংস্কার থেকেও ছিলেন মুক্ত। যে দাম্পত্য জীবনকে তিনি অস্বীকার করেছেন তা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র আক্ষেপ ছিল না। পেছন ফিরে তাকিয়ে সারা জীবন দীর্ঘশ্বাস ফেলার মানুষ তিনি নন। চিঠিটা পাওয়ার পরই ভঙ্গুর বিবাহিত জীবনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে হাতে যে শাঁখা ছিল তা খুলে ফেলেছেন তিনি, সিঁথি থেকে সিঁদুর ঘষে ঘষে মুছে দিয়েছেন। একমাসের দাম্পত্য জীবন এই ভাবেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সতের বছর বয়সে পুরুষদের সম্পর্কে যে মারাত্মক ধারণাটি তাঁর হয়েছিল তাতে নতুন করে বিয়েব ফাঁদে আর পা দিতে চাননি। মৃণালিনী বলেছেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর বিয়ের দরকার নেই।'

'কিন্তু—'

'আমার সম্বন্ধে অত ভেবে ভেবে এই বয়েসে কেন শরীর খারাপ করছ? শুধু এ বাড়িতে আমাকে একটু থাকতে দিও। আর কিছু দরকার নেই। আমি তো বাচ্চা মেয়ে নই। কিসে আমার ভালমন্দ সেটা বুঝি। আমার ভাবনা আমাকেই ভাবতে দাও।'

তারপর দশ বছর আগে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী না হওয়া পর্যন্ত একটানা স্কুলে পড়িয়ে গেছেন মৃণালিনী। হেড মিস্ট্রেসও হয়েছিলেন। এর মধ্যে শিবপ্রসাদ এবং তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ মৃণালিনীর মা মারা গেছেন।

'নারী জাগরণ'-এর প্রেসিডেন্ট অমিতা দত্তর সঙ্গে মৃণালিনীর জীবনের বেশ কিছুটা মিল আছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি অদিতির ছোটদি সুজাতাকে নিয়ে। সুজাতার স্বামী

এবং শ্বশুর ব্যবসার নাম করে রমাপ্রসাদের কাছে বেশ কিছু টাকা চেয়েছিল। কিন্তু তখন এ বাড়ির অবস্থা পড়ে গেছে। টাকা দেবার ক্ষমতা এদের ছিল না। ফলে সুজাতাকে আর বাপের বাড়ি আসতে দেওয়া হয় না। অদিতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একরকম শেষই হয়ে গেছে বলা যায়। তবে মন্দের মধ্যে এটুকুই ভাল, বধূহত্যার তালিকায় সুজাতার নামটা অন্তত ওঠেনি।

মৃণালিনীর মতো সুজাতার অতটা সাহস বা দৃঢ়তা ছিল না। শ্বশুর-বাড়ি থেকে মাথা উঁচু করে সে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সে ভীরু, সংস্কার-পন্থী। চোখের সামনে পিসির এমন একটা জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও সে উদ্দীপ্ত হয়নি। আসলে সুজাতা নিতান্তই ঘরোয়া মেয়ে। ঘর-সংসার স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে জড়িয়ে থাকতেই ভালবাসে। সাংসারিক বৃত্তির বাইরে পা বাড়াতে তার সাহস হয় না। যত অপমানিতই হোক শ্বশুর এবং স্বামীর সিদ্ধান্ত সে নিঃশব্দে মাথা পেতে মেনে নিয়েছিল।...

মৃণালিনী এবার বললেন, 'এই বিয়েতে আমি মত দিতাম বুবু যদি বুঝতাম সিতাংশু ভাল ছেলে। কিন্তু ওটা পাজির পা ঝাড়া—'

এতক্ষণ মৃণালিনী এবং সুজাতার অতীত জীবনের কথা ভাবছিল অদিতি। সে চমকে ওঠে।

মৃণালিনী থামেননি, 'দুশ্চরিত্র, লম্পট! অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে। এবার তোর দিকে নজর পড়েছে।'

অবাক হয়ে পিসিকে দেখতে থাকে অদিতি। এই মহিলা কি অলৌকিক কোনো ক্ষমতার অধিকারিণী? কারা যেন খড়ি পেতে ভূ-ভারতের সব খবর জেনে ফেলে, তেমনই কোনো অপার্থিব শক্তি কি তিনি আয়ত্ত করে ফেলেছেন? নাকি নখদর্পণের মতো কোনো গূঢ় বিদ্যা? ঘরে শুয়ে থেকে এত সব খবর পান কী করে? নিজের অজান্তেই অদিতি বলে, 'তুমি কেমন করে জানলে?'

মৃণালিনী বলেন, 'যখন খবর পেলাম তোর বাবা আর দাদারা সিতাংশুর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার মতলব করেছে তখন চিঠি লিখে টোকনকে ডাকিয়ে এনেছিলাম।'

টোকন অদিতির দূর সম্পর্কের খুড়তুতো ভাই। বছর দেড়েক আগে বি. এসসি পাশ করেই নিজের চেষ্টায় একটা বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ যোগাড় করে ফেলেছে। টোকন দারুণ তুখোড় আর স্মার্ট। অসম্ভব বলে তার কাছে কোনো ব্যাপারই নেই। যে কাজেই তাকে লাগিয়ে দেওয়া যাক, যেভাবেই হোক সেটি করবেই। তা ছাড়া অদিতিকে সে ভীষণ ভালবাসে, কেননা চাপা স্বভাবের এই জ্যাঠতুতো দিদিটি ছাত্রী হিসেবে ছিলেন দারুণ। তা ছাড়া স্বার্থপর বা আত্মকেন্দ্রিক নয়। দুঃস্থ, নির্যাতিত মেয়েদের জন্য বড় ভাল কাজ করছে—টোকনের কাছে এটা বিরাট ব্যাপার। আর মৃণালিনীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে সে। তাদের বংশের

প্রথম বিদ্রোহিনী এই পিসিটির বিশাল ইমেজ তার কাছে। এ বাড়িতে এলে মৃণালিনীর সঙ্গেই বেশিক্ষণ সময় কাটিয়ে যান। যে মহিলাটি সে আমলে শ্বশুরবাড়ির মুখে থুতু দিয়ে চলে এসেছিলেন তাঁর সাহস শক্তির কথা যত ভাবে ততই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়।

অদিতি এবং মৃণালিনী দরকার হলেই তাকে খবর দেন। পিসি যখন চিঠি দিয়ে ডাকিয়ে এনেছিলেন তখন গোয়েন্দা হিসেবে নিশ্চয়ই তাকে সিতাংশুর পেছনে লাগিয়ে দিয়েছেন এবং টোকন অবশ্যই তার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে গেছে। এ-সব কাজে টোকনের প্রচণ্ড উৎসাহ।

মৃণালিনী আবার বলেন, 'বুঝতেই পারছিস কেন টোকনকে চিঠি লিখেছি। ও পরশু জানিয়ে গেছে, সিতাংশু এর আগে দুবার বিয়ে করে দুবার ডিভোর্স করেছে। তা ছাড়া দু-একটা রক্ষিতাও নাকি আছে। তা ছাড়া প্রায়ই নতুন নতুন মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করতে গোয়া, গোপালপুর, এমনি সব জায়গায় যায়। কন্টাক্টরি করে লাখ লাখ টাকা করেছে—প্রচুর নাকি ব্ল্যাক মানি। পাপের টাকা এভাবেই খানিকটা ওড়াচ্ছে।'

অদিতি বলে, 'বাবা বড়দা ছোটদা এসব জানে ?'

'জানা তো উচিত।'

আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল অদিতি, দুর্গা এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। বলে, 'ছোটদি, বড়বাবু তোমাকে ডাকছেন। এক্ষুনি নিচে যাও—'

'ঠিক আছে, তুই যা। আমি আসছি।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় অদিতি। তার মুখচোখ দেখে মনে হয়, ভেতরে ভেতরে সিতাংশুর ব্যাপারে একটা কিছু সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে।

দরজার কাছ থেকে চলে যায় দুর্গা। মৃণালিনী অদিতিকে বলেন, 'চললি ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কথাটা মনে থাকে যেন।'

'থাকবে।'

নিচে নামতে নামতে অদিতি দেখতে পায়, দোতলার বারান্দায় বড় বৌদি বন্দনা আর ছোট বৌদি মীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। হেমলতাকে এবার আর দেখা যায় না। অদিতির পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তারা থমকে যায়। বোঝা যাচ্ছে, তার সম্পর্কেই দুই বৌদি কিছু আলোচনা করছিল।

বড় বৌদি বন্দনার বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। ছেলেপুলে হয়নি। খুবই গরীবের ঘরের মেয়ে বন্দনা। বরুণ অর্থাৎ বড়দা প্রেম করে তাকে বিয়ে করেছিল। বন্দনা যেমন চতুর তেমনি স্বার্থপর। পারিবারিক ডিপ্লোম্যাসিটা এমনভাবে চালিয়ে যায় যাতে ধরার উপায় নেই। কার সঙ্গে কী ব্যবহার করলে, কার কানে কী লাগালে, কার মন যুগিয়ে চললে স্বার্থটি বজায় থাকে,

সে সব সুচারুভাবে করে যায় বন্দনা। বাইরে থেকে তার আচার-আচরণে খুঁত চোখে পড়ে না। তার সঙ্গে কথা বললে সবাই ভাবে, এমন শুভাকাঙ্ক্ষী আর হয় না। কিছুদিন পর তার স্বরূপটি অবশ্য ধরা পড়ে। কিন্তু তখন যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। তাই বন্দনা সম্পর্কে ইদানীং সবাই খুব সতর্ক হয়ে থাকে, কেউ তার সামনে বেফাঁস কিছু বলে না।

মীরাও প্রেমের রাস্তাতেই, কিঞ্চিৎ ঘুরপথে এ-বাড়িতে এসে ঢুকেছিল। তবে ছোটদা মৃগাঙ্ক তাকে বিয়ে করে আনেনি। তিন মাসের বাচ্চা পেটে নিয়ে বিয়ের আগেই তার প্রবেশ। প্রথমটা মৃগাঙ্ক মীরার সন্তানের দায়িত্ব স্বীকার করতে চায়নি। এই নিয়ে প্রচুর ঝঞ্ঝাট হয়েছে। পরে পাড়ার ছেলে এবং পলিটিকাল পার্টিগুলোর চাপে সুড় সুড় করে বিয়ে করেছে। তাদের একটিমাত্র ছেলে—চিকু। সে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে!

মীরার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। তার বাপের বাড়ির অবস্থা বন্দনাদের তুলনায় অনেক ভাল। বন্দনার মতো সে অতটা স্বার্থপর বা ধুরন্দর নয়। তার মধ্যে কিছুটা উদারতা এবং সারল্য রয়েছে। অনেক সময় অদিতির সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি না দিয়ে যদি কারো ভাল হয় তাতে তার আপত্তি নেই।

দুই বৌদি একটিও কথা না বলে অদিতিকে লক্ষ করতে লাগল। অদিতি তাদের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।

একতলার ড্রইং-রুমে আসতে রমাপ্রসাদ বললেন, 'এত দেরি করলি। সেই কখন থেকে সিতাংশু বসে আছে।'

একটা ছেঁড়া জরাজীর্ণ সোফায় বসতে বসতে অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

সব জেনেশুনেও অদিতি বলে, 'কেন?'

বিব্রতভাবে রমাপ্রসাদ বলেন, 'এই তোর সঙ্গে একটু আলাপ করবে। তাই—'

অদিতি বলে, 'কার কাছে যেন শুনেছিলাম সিতাংশুবাবু একজন বিরাট বিল্ডার—বিশাল কনস্ট্রাকশান বিজনেস আছে ওঁর। কিন্তু সে ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি জানি সেক্সপীয়র শেলি কীটস টেনিসন সুইনবার্ন এলিয়ট। এঁদের নিয়ে আলোচনা করলে আমার আপত্তি নেই।'

বিপন্ন মুখে রমাপ্রসাদ বলেন, 'না, মানে—'

তীক্ষ্ন চোখে বাবাকে দেখতে দেখতে অদ্ভুত হাসে অদিতি। বলে, 'বাবা বড়দা ছোটদা, তোমরা ওপরে যাও। সিতাংশুবাবুর সঙ্গে আমিই আলাপ করে নিচ্ছি।'

অদিতি যা বলেছে তা প্রায় অভাবনীয়। তার মতো মার্জিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন

মেয়ে সবাইকে সরিয়ে সিতাংশুর সঙ্গে—সে সিতাংশুর মতলব খুব সম্ভব আন্দাজ করেছে—একা একা আলাপ করতে চাইছে, শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না। এর জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। সবাই প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। তারপর চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অদিতি এবার সিতাংশুকে বলে, 'আপনি চা খেয়েছেন?'

সিতাংশু শশব্যস্তে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আরেক বার দিতে বলব?'

'আপনি যদি খান তাহলে—'

'ঠিক আছে। আমি অবশ্য বেশি চা খাই না, তবে আপনাকে সঙ্গ দেবার জন্যে খাব।'

বিগলিত হেসে সিতাংশু বলে, 'ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদের কিছু নেই, মিস্টার—মিস্টার—'

'ভৌমিক।'

'হ্যাঁ, ভৌমিক। আপনি আমার জন্যে সাড়ে চার ঘণ্টা বসে আছেন। আর আমি আপনার জন্যে একটা কাপ চা খাব না, তাই কখনো হয়! নইলে অভদ্রতা হয়ে যাবে না?' বলে অদিতির মনে হয় একটু বেশি কথাই বলে ফেলেছে, অবশ্য সেজন্য তার সঙ্কোচ নেই। কেননা অদিতি জানে, স্বভাব-বিরুদ্ধ এই প্রগলভতাটুকু ইচ্ছে করেই করেছে।

আগের মতোই হেসে হেসে সিতাংশু তেলালো মুখে বলে, 'না না, এ কী বলছেন? অভদ্রতা হবে কেন?'

অদিতি জানে ঘরের বাইরে রমাপ্রসাদ না থাকুন, দুই দাদা নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও রয়েছে। সিতাংশুর সঙ্গে তার কথাবার্তা শোনার জন্য তাদের দম আটকে আছে। গলা তুলে অদিতি বলে, 'ছোটদা বড়দা, দুর্গাকে দিয়ে দু-কাপ চা পাঠিয়ে দিও—'

বরুণ বা মৃগাঙ্কর সাড়া পাওয়া যায় না। তবে কয়েক মিনিটের ভেতর চা দিয়ে যায় দুর্গা।

একটা কাপ তুলে নিয়ে অদিতি বলে, 'সারাদিন নানা কাজে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। আমি ভীষণ টায়ার্ড। আপনিও বেশ কিছুক্ষণ ওয়েট করছেন। বাজে ভণিতা না করে কাজের কথা শুরু করা যাক।'

সিতাংশু চায়ের কাপ তুলে নিয়েছিল। সে আলতো করে একটা চুমুক দিয়ে উৎসুক চোখে তাকায়। নারীসঙ্গ সে জীবনে অনেক করেছে। কিন্তু এই ধরনের মেয়ে আগে কখনও দেখেনি। সোজাসুজি যে কাজের কথায় আসতে চায় সে কেমন? অদিতি শিক্ষিত এবং আত্মমর্যাদাওলা মেয়ে। তবে তার বিশ্বাস পয়সা থাকলে পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দরী সব চেয়ে বিদুষীকেও তুড়ি মেরে নিজের বিছানায় তোলা যায়। কিন্তু অদিতি তাকে কিঞ্চিৎ ধন্দে ফেলে,

দিয়েছে। ঔৎসুক্যের সঙ্গে নিজের অজ্ঞান্তে সামান্য উৎকণ্ঠাও যেন মিশে যায় সিতাংশুর।

অদিতি সোজাসুজি সিতাংশুকে লক্ষ করতে করতে বলে, 'দেখুন, কেউ আমাকে স্ট্রেট কিছু বলেনি। তবে মাস দু-তিনেক ধরে খবর পাচ্ছি আপনি রেগুলারলি আমাদের বাড়ি আসছেন। আমার দাদাদের আপনি বন্ধু, বাবারও বিশেষ পরিচিত। আসাটা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে আমার মাথা ঘামাবার কিছু ছিল না। কিন্তু—'

'কী'

'কয়েক দিন হল টের পাচ্ছি, বাবা আর দাদারা চান আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক। আর সেই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে ওঁরা ঠিক করেছিলেন আজ আপনার সঙ্গে ফরমাল আলাপের সুযোগ দেবেন। ঠিক বলছি তো?'

কোনো মেয়ে সরাসরি এ জাতীয় কথা এত অসঙ্কোচে বলতে পারে সিতাংশুর ধারণা ছিল না। সে প্রথমটা অবাক হয়ে যায়। তারপর দ্বিধান্বিতভাবে বলে, 'ঠিক—'

'যদি আমার কোথাও ভুল হয় কারেক্ট করে দেবেন!'

সিতাংশু উত্তর দেয় না।

অদিতি আবার বলে, 'আপনি যখন কয়েক ঘণ্টা ওয়েট করছেন তখন ধরে নিতে পারি এ বিয়ে না হলে আপনি খুবই হতাশ হবেন।'

চোখ নামিয়ে আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় সিতাংশু।

অদিতি বলে, 'যাক বিয়ের ব্যাপারে আপনার পরিষ্কার মতামতটা যখন জানা গেল তখন আলোচনা করতে সুবিধে হবে।'

সিতাংশু এবারও কিছু না বলে অদিতির দিকে তাকায়।

অদিতি বলে, 'আমার সম্পর্কে আপনি কতটা কী জানেন?'

সিতাংশু চকিত হয়ে ওঠে, 'মানে!'

অদিতি বলে, 'যাকে বিয়ে করতে চান তার বিষয়ে সব কিছু জানা তো দরকার। বাবা আর দাদারা হয়ত কিছু বলেছে। তবু নিজেই নিজের সম্বন্ধে আপনাকে কিছু ইনফরমেশন দিই। তাতে আমাকে বুঝতে আপনার পক্ষে সুবিধা হবে।'

সিতাংশু স্মার্ট হবার চেষ্টা করে, 'বেশ। ডিসকাসানটা খোলামেলা হওয়াই ভাল।' একটু থেমে বলে, 'সিগারেট খেলে আপনার আপত্তি নেই তো?'

'নট অ্যাট অল।' অদিতি বলতে থাকে, 'আমি ডিভোর্সী নই, আগে আমার বিয়ে হয়নি। ভার্জিন কুমারী মেয়ে বলতে যা বোঝা যায় আমি তা-ই। তবে—'

'তবে কী?'

'আপনি হয়ত জানেন আমি একটা কলেজে পড়াই।'

'জানি।'

'সেখানে আমার বেশির ভাগ কলীগই পুরুষ। এ ছাড়াও নানা দরকারে বহু পুরুষের সঙ্গে মিশতে হয়। অসংখ্য বয়-ফ্রেন্ড রয়েছে আমার।'

'এ নিয়ে আমার কোনোরকম শুচিবাই নেই। আজকালকার দিনে আমাদের সোসাইটি অনেক ফ্রী হয়ে গেছে। মেয়ে আর পুরুষের মেলামেশাটা কোনো ব্যাপারই নয়।'

'ফাইন।'

'আপনি এদিক থেকে বেশ উদার দেখছি। এমন অ্যাটিচুডই বাঞ্ছনীয়।'

সিতাংশু বেশ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ। যে কোনো অফিসে, স্কুল-কলেজে, এমন কি পুলিশ ডিপার্টমেন্টেও মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি বসে কাজ করছে। সম্পর্কটা কত সহজ হয়ে গেছে।'

অদিতি বলে, 'আপনি কি জানেন 'নারী-জাগরণ' নামে আমাদের একটা অরগানাইজেশন আছে?'

'না।' একটু অবাক হয়েই সিতাংশু জিজ্ঞেস করে, 'সেটা কী?'

'নারী-জাগরণ'-এর উদ্দেশ্য সংক্ষেপে জানিয়ে অদিতি যা বলে তা এই-রকম। পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা নানা কুসংস্কার এবং শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে আছে। এই নারীদের মুক্তির জন্যই তাদের সংগঠন অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে। যেভাবেই হোক মেয়েদের ওপর লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার বন্ধ করতেই হবে। যতদিন না নারীর সম্মান মর্যাদা আর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, 'নারী-জাগরণ'-এর লড়াই চলবেই।

রীতিমত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে সিতাংশু। বলে, 'এ তো বিরাট কাজ। এতে আমার সাপোর্ট আছে।'

অদিতি বলে, 'শুনে খুব খুশি হলাম।'

'যদি ডোনেশন নিতে আপনারা রাজী থাকেন, আমি দেব।'

'ধন্যবাদ। তেমন দরকার হলে নিশ্চয়ই আপনার কাছে 'নারী-জাগরণ' হাত পাতবে।'

সিতাংশু অল্প হাসে, উত্তর দেয় না। আগেই একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছিল সে, আস্তে সেটা টানতে থাকে।

অদিতি থামেনি। সে বলে, 'নারী মুক্তির জন্যে যখন আন্দোলন করছি তখন বুঝতেই পারছেন আমি কী টাইপের মেয়ে। আমার যিনি স্বামী হবেন তাঁকে গ্যারান্টি দিতে হবে, বিয়ের পর আমার স্বাধীনতায় হাত দিতে পারবেন না। আমি কোথায় যাব, কার সঙ্গে মিশব, কখন বাড়ি ফিরব—এসব নিয়ে প্রশ্ন করা চলবে না।'

সিতাংশু নড়েচড়ে বসে। অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলে, 'কিন্তু

সংসারের দিকটাও তো মেয়েদের দেখা উচিত। সারাক্ষণ ঘরের বউরা বাইরে থাকলে পারিবারিক ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়ে যায়। তারাই তো সংসারকে ধরে রাখে।'

'নিশ্চয়ই।' অদিতি বলে যায়, 'সংসারের ব্যাপারে আমার যেটুকু কর্তব্য তা তো করতেই হবে।'

সিতাংশুর মুখ দেখে মনে হয়, অদিতির কথায় খুশি হয়েছে।

একটু চুপচাপ।

তারপর কিছুটা ইতস্তত করে সিতাংশু বলে, 'আমার সামান্য একটা অনুরোধ ছিল—'

'বলুন।'

'ব্যবসা করে আমার টাকা পয়সার অভাব নেই। আমার স্ত্রী চাকরি করবেন, এটা ভাল লাগছে না। মানে, অভাব হলে তবেই তো মানুষ রোজগারের চেষ্টা করে। তার যখন প্রয়োজন নেই—' বলতে বলতে থেমে যায় সিতাংশু।

অদিতি স্থির চোখে সিতাংশুকে লক্ষ করতে করতে বলে, 'চাকরির ব্যাপারটা আগে ঠিক করে নেওয়া যাক। আপনার কত টাকা আছে, আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তবে ফোর্ড বা রকফেলারের বাড়িতে বিয়ে হলেও চাকরিটা ছাড়তে পারব না। আর্থিক স্বাধীনতা আমার কাছে খুবই ইমপর্টান্ট ব্যাপার।' না থেমে একটানা সে বলে যায়, 'আশা করি চাকরির বিষয়টা আপনার কাছে ক্লিয়ার করে দিতে পেরেছি।'

সিতাংশুর ধারণা ছিল, তার টাকা এবং ব্যবসা-ট্যবসার কথা শুনলে এক কথায় চাকরি ছেড়ে দেবে অদিতি। কিন্তু উত্তর শুনে ভেতরে ভেতরে একটু থমকে যায় সে। আস্তে করে বলে, 'হ্যাঁ। চাকরি করার যখন এত ইচ্ছে তখন আর কী বলব। ঠিক আছে, তা-ই করো তুমি।' বেশ সচেতন ভাবেই, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যই হয়ত, অদিতিকে তুমি করে বলতে শুরু করে সে।

অদিতি দ্রুত একটি আঙুল তুলে জোরে মাথা নাড়ে, উঁহু উঁহু—'

রীতিমত অবাকই হয়ে যায় সিতাংশু, 'কী হল?'

'এখনও আমরা তুমি বলার স্টেজে আসিনি। আরো কয়েকটা বিষয় আমাদের পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর ভাবা যাবে আমরা কতটা ঘনিষ্ঠ হব।'

সিতাংশু বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করে, 'কী কী বিষয়?'

'আমার সম্বন্ধে জরুরি ইনফরমেশনগুলো মোটামুটি সবই দিয়েছি মিস্টার ভৌমিক। কিন্তু—'

'বলুন—'

'নিজের সম্বন্ধে আপনি এখনও কিছু জানাননি। বেটার আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিংয়ের জন্যে ওটা আমার জানার দরকার—তাই না?'

কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে সিতাংশু। খানিকক্ষণ চুপ করে কিছু ভাবে। তারপর সিগারেটের বাকি অংশটুকু অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রেখে বলে, 'অবশ্যই।'

শান্ত গভীর চোখে পলকহীন তাকিয়ে থাকে অদিতি।

সিতাংশু যথেষ্ট ধুরন্ধর। তার যা কাজ কারবার তাতে বহু মানুষ চরিয়ে খেতে হয়। অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে তৎপর ভঙ্গিতে বলে, 'আমার সম্বন্ধে কী কী ইনফরমেসন পেলে আপনার সুবিধা হয় বলুন।'

'আমি কতদূর লেখাপড়া করেছি, সে সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

'মোটামুটি। আপনার বাবা আর দাদাদের মুখে শুনেছি আপনি এম. এ পাশ করেছেন।'

'দ্যাটস নট পারফেক্ট ইনফরমেসন। সঠিক খবরটা হল আমি ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে এম এ পাশ করেছি। একটা কলেজে কাজ করি। প্রথমেই জানতে ইচ্ছে হবে, যিনি আমার স্বামী হবে তাঁর এডুকেশানাল কোয়ালি-ফিকেশান কী।'

গলার স্বরে জোর দিয়ে সিতাংশু বলে, 'নিশ্চয়ই। আমি একজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। শিবপুর থেকে পাশ করেছি।'

'ঠিক আছে। শুনেছি আপনি একজন বিজনেসম্যান। কনস্ট্রাকসনের ব্যবসা করেন।'

'হ্যাঁ। বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউস, হাই রাইজ অফিস বিল্ডিং, সিনেমা হল, ব্রিজ—এইসব তৈরি করে আমার ফার্ম।'

'এর সঙ্গে ব্ল্যাক মানির সম্পর্ক কতটা?'

ভীষণ হকচকিয়ে যায় সিতাংশু। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, অস্বীকার করব না, কিছুটা তো রয়েছেই। ইণ্ডিয়াতে এমন কোনো বিজনেস আপনি দেখাতে পারবেন না যার সঙ্গে ব্ল্যাক মানি ইনভলভড নেই। দিস ইজ আ পার্ট অফ দি গেম। নান ক্যান হেল্প।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, 'হঠাৎ ব্ল্যাক মানির কথা জানতে চাইলেন?'

'বিয়ের পর বাড়িতে সি বি আই আর ইনকাম ট্যাক্স রেইড হতে পারে কিনা সেটাই বুঝতে চাইছি।'

হেসে হেসে হাল্কা গলায় সিতাংশু বলে, 'আজকাল এই রেইডগুলো হল স্টেটাস সিম্বল। এ দিয়ে প্রমাণ হয় য়ু আর সামবডি। তবে—'

'কী?'

'আমাদের মতো ছোটোখাটো বিজনেসম্যানদের সি. বি. আইওয়ালারা কাউন্টই করে না। ভয় নেই, কেউ রেইড করতে আসবে না।'

অদিতি বলে, 'না এলেও এই সব ব্ল্যাক মানি-টানি খুবই অস্বস্তিকর ব্যাপার। এটা এক ধরনের সোসাল ক্রাইম।'

সিতাংশু বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হয় না। সামাজিক পাপপুণ্য সম্পর্কে তার ধ্যানধারণা কিঞ্চিৎ আলাদা রকমের। সে মজার গলায় বলে, 'ওইরকম একটু আধটু ক্রাইম না করলে ব্যবসা করা যায় না। জানেন কত জায়গায় ঘুষ দিতে হয়? কেউ কি হোয়াইট মানিতে উৎকোচ নেয়?'

সিতাংশুকে লক্ষ করতে করতে অদিতি বলে, 'আমি কিছু ওল্ড ভ্যালুজে বিশ্বাসী মিস্টার ভৌমিক। মানুষের বিশেষ করে প্রিয়জনদের মধ্যে মিনিমাম অনেস্টিটুকু দেখলে আমার আনন্দ হয়।'

ব্যস্তভাবে সিতাংশু বলে আমিও সেন্ট পারসেন্ট অনেস্ট থাকতে চাই। কিন্তু ওই যে একটু আগে বললাম, ব্ল্যাক মানি ছাড়া বিজনেসে একটা স্টেপও ফেলা যায় না। অনেস্টি নিয়ে চললে সাতদিনে আমার কোম্পানি বন্ধ করে দিতে হবে। আর নীট রেজাল্টও কী হবে ভাবতে পারেন?'

অদিতি বলে, 'কী?'

সিতাংশু সামনের দিকে ঝুঁকে উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে, 'চারশো ওয়ার্কার সঙ্গে সঙ্গে বেকার হয়ে যাবে। এই লোকগুলোর ভবিষ্যৎ কী, তারা কী খাবে, কী হবে তাদের ছেলেমেয়ের—এ সবও তো মাথায় রাখতে হয়।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে অদিতি বলে, 'অনেস্ট হওয়ার সমস্যাও তা হলে আছে দেখছি।'

সিতাংশু বলে, 'আমাদের সোসিও-ইকনমিক প্যাটার্নটাই এরকম দাঁড়িয়ে গেছে। দু-একজন অনেস্ট হয়ে কী করবে? নিজেরা তো ধ্বংস হবেই। তাদের ঘিরে যারা আছে তারাও শেষ হয়ে যাবে। আমাদের সোসাইটির আগাপাশতলা সব নষ্ট হয়ে গেছে।'

অদিতি সিতাংশুর দিক থেকে চোখ সরায়নি। সে ধীরে ধীরে, প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণে বলে, 'ডিজঅনেস্টি যদি চারশোটা ফ্যামিলিকে বাঁচাতে পারে, তা হলে সততা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে—না কী বলেন?'

অদিতির কণ্ঠস্বরে বা বলার ধরনে কি চাপা বিদ্রূপ রয়েছে? ঠিক বোঝা যায় না। উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সিতাংশু।

অদিতি বলে, আপনার অনেস্টি-ডিজঅনেস্টি সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাওয়া গেল। এবার অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। আপনার একজাক্ট বয়স কত।'

বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলের মতো উল্টোপাল্টা জেরা করে অদিতি তার কাছ থেকে কোন গোপন তথ্য বার করে নিতে চাইছে, বোঝা যাচ্ছে না। সে সতর্ক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে, 'বয়েস জানতে চাইছেন কেন?'

'বলুন না—'

'চল্লিশের কাছাকাছি।'

'আমাদের দেশের পক্ষে বিয়ের বয়েসটা অনেক আগে পার হয়ে এসেছেন। পুরনো কাল হলে বানপ্রস্থের আগের স্টেজে চলে যেতেন।' বলতে বলতে সামনের দিকে ঝুঁকে গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে দেয়, 'এতদিন বিয়ে করেন নি যে? এত পয়সা আপনার, চারশো ওয়ার্কার যার ব্যবসাতে খাটে তাকে তো দস্তুরমতো সাকসেসফুল পার্সন বলা যায়। তা হলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ওয়েট করতে হল কেন?'

হঠাৎ ভীষণ ঘাবড়ে যায় সিতাংশু। তার মতো একজন স্মার্ট ঝানু বিজনেসম্যানও উপযুক্ত উত্তরটি খুঁজে পায় না। কোনোরকমে সে বলে, 'আমি —আমি—মানে—'

অদিতি আস্তে আস্তে বলে, 'আমি আপনার সম্বন্ধে একটা খবর পেয়েছি। সেটা কতদূর সত্যি, আদৌ সত্যি কিনা, আপনিই শুধু বলতে পারবেন।' তিনটে বিয়ের কথাই মৃণালিনী তাকে জানিয়েছেন কিনা, সে মনে করতে পারল না। অবশ্য সিতাংশু তিনটে করুক কি দশটা করুক, সংখ্যায় তার কিছু আসে যায় না।

সিতাংশু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়। স্নায়ু টান টান করে জিজ্ঞেস করে, 'কী খবর?'

'আপনি আগে তিনবার বিয়ে করেছেন। একবার ডিভোর্স হয়েছে। একবার—'

অদিতির কথা শেষ হওয়ার আগেই সিতাংশু শশব্যস্তে বলে ওঠে, 'প্রথম বিয়েটা হয়েছিল নামমাত্র। অ্যাডজাস্টমেন্ট হল না, বছর খানেকের ভেতর মিউচুয়ালি সেপারেসন নিয়ে নিই।'

অদিতি বলে, 'আর সেকেন্ড ম্যারেজ? শুনেছি মিস্টিরিয়াস অবস্থায় আপনার দ্বিতীয় স্ত্রী আগুনে পুড়ে মারা যান। ব্যাপারটা থানা পুলিশ পর্যন্ত নাকি গড়িয়েছিল? ইজ ইট কারেক্ট?'

সিতাংশুর কপালে দানা দানা ঘাম জমতে থাকে। রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে সে বলে, 'কে আপনাকে এ সব বাজে খবর দিয়েছে জানি না। মনে হয়, বিজনেসে আমার যারা শত্রুপক্ষ তারাই এভাবে ক্যারেকটার অ্যাস-অ্যাসিনেসন করছে। ইটস আ ডার্টি স্লেন্ডারিং এগনেস্ট মী। আসলে ঘটনাটা খুবই আনফরচুনেট। একটা গ্যাস সিলিন্ডার বার্স্ট করে রমলা, মানে আমার দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যায়। এ নিয়ে থানা-পুলিশের ইনভলভমেন্টটা সম্পূর্ণ মিথ্যে।' একটানা দম-আটকানো গলায় বলে যায় সে, তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'এর ভেতর যদি কোনোরকম গোলমাল থাকত, এতদিন জেলে পচে মরতাম। আপনার সঙ্গে এভাবে বসে কথা বলার সুযোগ হত না। দ্যাটস

আ রেটাস্ট লাই অ্যান্ড হীনাস স্লেন্ডার।'

অদিতি বলে, 'আপনার মতো একজন বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলোক যখন বলছেন তখন তা বিশ্বাস করা উচিত। আমিও করলাম। এবার থার্ড ম্যারেজের কী গতি হল, বলুন।'

অদিতির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না সিতাংশু। ঘাড় ভেঙে তার মাথা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে। সে বলে, 'সেটাও আমার পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। রেখার সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত অ্যাডজাস্ট করা গেল না। কোর্ট থেকে আমরা ডিভোর্স নিয়েছি বছর তিনেক আগে।'

তৃতীয় বিয়েটার কথা স্রেফ আন্দাজেই বলেছে অদিতি। দেখা গেল, সেটাও লেগে গেছে। কে জানে, আরো ডজনখানেক বিয়ে সিতাংশু করে বসে আছে কিনা। এমন কৃতী বিবাহ-বিশারদ আগে চোখে পড়েনি। শুধু বইতেই তাদের কথা পড়া গেছে। এইটীনথ নাইনটীনথ সেঞ্চুরির কুলীন ব্রাহ্মণরা এভাবে একের পর এক বিয়ের অভিযান চালাত। সিতাংশুর পদবী ভৌমিক। লোকটা অব্রাহ্মণ হলেও সেই ট্রাডিসানের খানিকটা টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির শেষ দিকেও বজায় রাখতে পেরেছে। খুব মজাই লাগছিল অদিতির। সেই সঙ্গে অসহ্য রাগও। অত্যন্ত শান্ত নিস্পৃহ মুখে সে বলে, 'আপনি যে কোনো কিছু না লুকিয়ে সব কথা ফ্রাঙ্কলি জানিয়েছেন, সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

গল গল করে ঘামতে ঘামতে এবং সেই ঘাম মুছতে মুছতে সিতাংশু বলে, 'লুকোবার কী আছে? যা ঘটেছে তা একদিন না একদিন জানাজানি হয়ে যাবেই। আমি আর কদিন চাপা দিয়ে রাখতে পারব?'

'দ্যাট শুড বী দা স্পিরিট। অদিতি বলতে থাকে, 'আরও কিছু খবর আমার কানে এসেছে। যদিও কোনোরকম রিউমার আমি গ্রাহ্য করি না, তবু ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে শুনলে আপনাকে বুঝতে আমার পক্ষে সুবিধে হয়। মানে কিছুক্ষণ আগে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের কথা হয়েছিল না, সেটা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে খুবই জরুরি।'

'আমার সম্বন্ধে আর কী শুনেছেন?' সিতাংশুর চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠতে থাকে।

যেন খুবই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে, এমনভাবে অদিতি বলে, 'আপনি যদি কথা দ্যান কিছু মনে করবেন না, তবেই বলতে পারি। ব্যাপারটা খুবই ডেলিকেট কিনা।' বলেই খেয়াল হয় তার তো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে এমন একটা দুশ্চরিত্র স্কাউন্ড্রেলকে বাড়ি থেকে বার করে দেবার কথা। কিন্তু বজ্জাতটার বিড়ম্বিত মুখ দেখে একটু মজা করতে ইচ্ছা করছে।

এই মুহূর্তে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতো দেখাচ্ছে সিতাংশুকে। সে শুকনো গলায় বলে, 'যত ডেলিকেটই হোক, আমি শুনব।'

অদিতি কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলে, সঙ্কোচ হচ্ছে, তবু বলি। শুনেছি, কয়েকটা ফ্ল্যাট কিনে আপনি চার পাঁচজন রক্ষিতা রেখেছেন।'

দ্রুত মাথা তোলে সিতাংশু। তার মুখ থেকে পরতে পরতে রক্ত নেমে গিয়ে একেবারে ফ্যাকাসে দেখায়। ঝাপসা গলায় সে বলে, 'কারা—কারা এসব রটিয়ে বেড়াচ্ছে? দিজ আর অ্যাবসোলুটলি ফলস্!'

অদিতি হাসে, 'আপনার চোখমুখ কিন্তু অন্য কথা বলছে মিস্টার ভৌমিক।'

'কী বলতে চাইছেন আপনি?'

'যা বলার তা তো বলেই ফেলেছি। তার ভেতরে এতটুকু অস্পষ্টতা নেই। বিয়ের ব্যাপারে আপনি যেভাবে বললেন, আশা করি রক্ষিতাদের বিষয়েও ঠিক সেইরকম ফ্র্যাঙ্ক হবেন।'

কয়েক সেকেন্ড আগে সিতাংশুর মুখটা একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। এবার শরীরের সব রক্ত সেখানে উঠে এসে মুখটাকে ভয়ঙ্কর করে তোলে। সে বলে, 'কার কাছ থেকে আপনি এ খবর পেয়েছেন?'

'যার কাছ থেকেই পাই, তার নাম বলব না। কথাটা সত্যি কিনা সেইটুকুই শুধু জানতে চাইছি।'

সিতাংশু উত্তর দেয় না। তার চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে।

অদিতি বলে, 'ভিকটোরিয়ান মরালিটি বলতে যা বোঝায় আমি তা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাই না। মানুষের বায়োলজিকাল প্রয়োজনটা বাস্তব ব্যাপার। নীতি-টীতি দিয়ে সেটা ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এনিওয়ে আপনার হয়ত বলতে লজ্জা হচ্ছে। ধরেই নিলাম, এ ব্যাপারে যা শুনেছি, সেটা রিউমার নয়।'

মুখের কাঠিন্য বাড়তে থাকে সিতাংশুর। মাথায় প্রচণ্ড রক্তচাপ অনুভব করে সে। বিস্ফোরণই ঘটিয়ে দিত কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলে নিয়ে রুক্ষ গলায় বলে, 'সেটা ডেফিনিটলি রিউমার।'

'আপনি তা হলে ওই ব্যাপারটা অস্বীকার করছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'এই টপিকটা তবে থাক।'

'আচ্ছা—'

'বলুন।'

'আমার সম্বন্ধে প্লেন্ডারিং-এর খবরই শুধু আপনার কানে এসেছে। একটাও ভাল ইনফরমেসন পাননি?'

চমকে ওঠার মতো ভঙ্গি করে অদিতি বলে, 'পেয়েছি বৈকি, অবশ্যই পেয়েছি।'

সিতাংশুকে কিছুটা উৎসুক দেখায়, তবে মুখের সেই কঠোরতা কমে না।

সে বলে, 'কী পেয়েছেন?'

'আপনি অত্যন্ত দয়ালু। আপনার মতো হৃদয়বান মানুষ খুব বেশি দেখা যায় না।' বলতে বলতে অদিতির মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে যায়।

সিতাংশু ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ে। এই মেয়েটাকে সে একেবারেই বুঝতে পারছে না। একটু আগে যে অদিতি রক্ষিতাদের ব্যাপারে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, সে-ই কিনা এখন কোমল গলায় এমন কিছু বলছে যার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না সিতাংশু। এক প্রসঙ্গ থেকে দ্রুত এবং অভাবনীয় এমন একেক দিকে সে সরে যাচ্ছে যে খেই রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে, মেয়েটা তাকে বাঁদর নাচ নাচিয়ে চলেছে। কিন্তু তার সারল্য-ভরা মুখ দেখে মনে হয় তা না-ও হতে পারে। খুবই ধন্দের ভেতর পড়ে গেছে সিতাংশু! বিমূঢ়ের মতো বলে, 'মানে?'

'শুনেছি কেউ বিপদে পড়লে আপনি টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন।'

মুখের সেই কর্কশ কাঠিন্য এখন আর নেই সিতাংশুর। লাজুক হেসে নরম গলায় সে বলে, 'না না, ওটা এমন কিছু ব্যাপার না। কারও দুঃখের দিনে যদি পাশে গিয়ে না দাঁড়াই সোসাইটিতে বাস করা কেন? সামাজিক কিছু দায়-দায়িত্বও তো থাকা দরকার।' একটু থেমে ফের বলে, 'আপনি নিজে তো একজন সোসাল ওয়ার্কার—আপনিই বলুন লোকের বিপদে সাহায্য করাটা ঠিক কিনা।'

'একশোবার ঠিক।' অদিতি আস্তে মাথা নেড়ে বলতে থাকে, 'আচ্ছা মিস্টার ভৌমিক—'

'বলুন।'

'এখন পর্যন্ত কত লোককে আপনি সাহায্য করেছেন?'

অত্যন্ত পরিতৃপ্ত এবং খুশি দেখাচ্ছে সিতাংশুকে। অদিতি যে পরোপকারের কারণে তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। বিপন্ন দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করার খবর তাকে কে দিয়েছে কে জানে। যে-ই দিয়ে থাক, সিতাংশু তার কাছে কৃতজ্ঞ। যদিও সাহায্যের ব্যাপারটা কতখানি সত্যি তার চেয়ে কেউ তা ভাল জানে না। সিতাংশু বুঝতে পারে, অদিতি এমন একটি মেয়ে, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, দামী গাড়ি-বাড়ি, বিলাসের উপকরণ বা অঢেল আরাম দিয়ে যার মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে না। যাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারবে তেমন একটি পুরুষকেই শুধু বিয়ে করবে। সিতাংশু মনে মনে ঠিক করে ফেলে তার সম্পর্কে অদিতির যে দুর্বলতাটুকু দেখা দিয়েছে সেটাকে টোকা মেরে মেরে উসকে দেবে। এই মেয়েটাকে জয় করার মধ্যে উন্মাদনা আছে। সিতাংশু যেন এক ধরনের যুদ্ধেই নেমে পড়েছে। কোণঠাসা হতে হতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল তার। এতক্ষণে সে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। যুদ্ধটা তাকে জিততেই হবে।

সিতাংশু বলে, 'এসব জিজ্ঞেস করলে খুব লজ্জা পাই। আমার সারপ্লাস কিছু টাকা আছে। লোকের দরকারে দিই। কাকে দিলাম, কেন দিলাম— সে সব মনে করে রাখি না।'

অদিতি বলে, 'তাই তো উচিত। এ সব গ্রেটনেসের লক্ষণ। যারা কিছু দিয়েই ঢাক পিটিয়ে প্রচারে নামে তাদের আমি ঘৃণা করি।'

সিতাংশু উত্তর দেয় না। তার মুখ তরল চবচবে হাসিতে ভরে যায়।

অদিতি এবার বলে, 'আপনি মনে করে না রাখলেও আমি তিনজনের নাম বলে দিতে পারি যাদের আপনি প্রচুর টাকা দিয়েছেন।'

সিতাংশু একটু অবাক হয়েই বলে, 'তারা কারা ?'

অদিতি বলে, 'আমার বাবা আর দুই দাদা—'

সিতাংশু কিসের একটা সংকেত পেয়ে চমকে ওঠে। মুখের হাসি, কৃতার্থ ভাব মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়। স্থির চোখে অদিতিকে লক্ষ করতে থাকে সে।

অদিতি বলে, 'বাবা আর দাদাদের কত দিয়েছেন আপনি ?' তার কণ্ঠস্বরে একটু আগের কোমলতা নেই, চাপা তীব্রতা বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে।

আক্রমণটা এমনই আকস্মিক যে কী উত্তর দেবে, প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারে না সিতাংশু। যেরকম ভাবা গিয়েছিল, অন্তত ভাবতে ইচ্ছা হচ্ছিল, আদপেই ততটা সরল নয় অদিতি। জীবনে এই প্রথম এত তুখোড়, এত বুদ্ধিমতী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছে সে। তার সংশয় হয় ভেতরে ভেতরে বুঝিবা খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে। কোনোরকমে বলে, 'আপনি, মানে—'

চোখ মুখ ক্রমশ ধারালো হয়ে উঠতে থাকে অদিতির। সে বলে, 'আমার কথার উত্তর দিন। কত টাকা দিয়েছেন ? কারেক্ট ফিগারটা আমি জানতে চাই।'

অদিতির বলার ধরনে এমন একটা কর্তৃত্ব রয়েছে যা সিতাংশুকে প্রায় মাটিতে নুইয়ে রাখে। স্নায়ুচাপ আর নার্ভাসিনেস কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করে সে কিন্তু প্রথমটা পেয়ে ওঠে না। মিনমিনে গলায় কিছু একটা বলে, কিন্তু তার একটি বর্ণও বোঝা যায় না।

অদিতি একটু ভেবে বলে, 'আপনার তো আবার দান-টান করে কিছুই মনে থাকে না। আমি হেল্প করছি। আশা করি মনে পড়ে যাবে। বাবা আর দাদাদের এখন পর্যন্ত সাড়ে চার লাখ টাকার মতো দিয়েছেন। তাই না ?'

সিতাংশু নিরুত্তর।

অদিতি বলে, 'ভুল হলে কারেক্ট করে দেবেন প্লীজ।'

সিতাংশু চুপ করে থাকে।

অদিতি থামেনি, 'এতগুলো টাকার কী গতি হয়েছে আপনি কি জানেন?'

সিতাংশু এবারও উত্তর দেয় না।

অদিতি বলতে থাকে, 'ডেফিনিটলি আপনি জানেন কিন্তু আমাকে বলতে বোধ হয় আটকাচ্ছে। ঠিক আছে, তবু বলেই ফেলি। টাকাগুলো কোনো পুণ্যকর্মে খরচ করা হয়নি। বাবা শেয়ার মার্কেটের ফাটকাবাজিতে আর দুই দাদা রেস গ্যাম্বলিং উইম্যানাইজিংয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। আমার ধারণা, এইসব মহৎ উদ্দেশ্যে বাবা দাদারা চাইলে আরো টাকা আপনি দেবেন। কারেক্ট?' একটু থেমে পরক্ষণেই আবার শুরু করে, 'মিস্টার ভৌমিক, লোকে দু-পাঁচশো, বড় জোর হাজার দু-হাজার পর্যন্ত দান-টান করে। কিন্তু বিনা স্বার্থে সাড়ে চার লাখ টাকা দিয়ে বসেছে, এমন দানবীরকে চোখে তো দেখিই নি, নামও শুনিনি। আমার ধারণা—' কথাটা শেষ না করে থেমে যায়।

এতক্ষণে সিতাংশুর গলা থেকে একটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে আসে, 'কী?'

নিশ্চয়ই স্ট্যাম্পড কাগজে বাবা দাদাদের দিয়ে সই করিয়ে এই টাকাগুলো আপনি দিয়েছেন। কেননা এই বাড়িটা ছাড়া বাঁধা রেখে এত টাকা পাওয়ার মতো প্রোপার্টি আমাদের নেই। এনিওয়ে, কী কী শর্তে টাকা দিয়েছেন সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি।'

একটা ঢোক গিলে সিতাংশু বলে, 'বুঝতেই পারেন, অনেকগুলো টাকা তো—'

'ডেফিনিটলি পারি।' অদিতি বলতে থাকে, 'শর্তগুলো কী ধরনের নিজের মুখে দয়া করে বলবেন?'

বিব্রত মুখে সিতাংশু বলে, 'না না, তেমন রিজিড কিছু নয়। ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।'

অদিতি সিতাংশুর মুখ থেকে চোখ সরায়নি। সে বলে, 'আপনার নেই, আমাদের আছে। সাড়ে চার লাখ টাকা ইন্টারেস্টসুদ্ধু পার্টিকুলার একটা পীরিয়ডের ভেতর ফেরত দিতে না পারলে, আরো কিছু টাকা দিয়ে ওই বাড়িটা আপনি দখল করবেন, এই তো?'

'মানে আমি তো একজন বিজনেসম্যান। তাই—'

সিতাংশুর কথা শেষ হবার আগেই হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয় অদিতি, 'লেট মী ফিনিশ। প্রথম দিকে হয়ত আপনার ইচ্ছে ছিল, এই বিরাট কম্পাউন্ডওলা বাড়িটার পজেসান নিয়ে পুরনো বিল্ডিং ভেঙে এখানে হাই-রাইজ বিল্ডিং বানিয়ে বেচে দেবেন। তাতে মিনিমাম এক কোটি টাকা লাভ হবে। আফটার অল, ইউ আর ইন দা কনস্ট্রাকসান বিজনেস। কি, ঠিক বলছি?'

সিতাংশু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। এই মেয়েটির সঙ্গে আগে কখনও আলাপ হয়নি। রমাপ্রসাদ বরুণ এবং মৃগাঙ্কর সঙ্গে তার যা কথাবার্তা

হয়েছে সেটা এতই গোপন যে কারো পক্ষেই তার-আঁচ পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু অদিতি টের পেল কী করে? যদি তার এখানে নিয়মিত যাতায়াত এবং রমাপ্রসাদদের টাকা দেওয়া থেকে এ-সব ধরে নিয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে অদিতির মতো অসাধারণ বুদ্ধিমতী এই পৃথিবীতে খুব বেশি নেই।

সিতাংশু খানিকটা সাফাই গাওয়ার সুরে বলে, 'লাভ-লোকসানের প্রশ্নটা সেভাবে বোধ হয় না তোলাই ভাল। আপনাদের এখানে প্রচুর আনইউটিলাইজড জমি পড়ে আছে। তাছাড়া পুরনো আর্কিটাকচারের যে বাড়িটা রয়েছে সেটা আজকাল অচল। এত জমি ফেলে রাখার মানে হয় না। আমার প্রস্তাব ছিল যদি একটা হাই-রাইজ বানানো যায় তাতে রমাপ্রসাদবাবু বরুণবাবু আর মৃগাঙ্কবাবু আরো অনেক টাকা পাবেন। এই আর কি।' একটু ভেবে বলে, 'ইন্ডিয়ার অন্য বড় বড় শহরে কবে থেকেই এসব চালু হয়ে গেছে। তুলনায় কলকাতায় এ ব্যাপারটা নতুন। এ ছাড়া উপায় নেই।'

অদিতি বলে, 'বুঝলাম। কিন্তু হাইরাইজ তোলার চিন্তাটা গোড়ার দিকে নিশ্চয়ই আপনার ভাবনাচিন্তায় ছিল। পরে অবশ্য অন্যভাবে ভাবতে শুরু করেন, তাই না?'

সিতাংশু কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই অদিতি আবার শুরু করে, 'এবার শুনুন, তার পরের স্টেজটা এরকম হয়েছিল কিনা। হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের ব্যাপারটা প্ল্যান করতে করতে হঠাৎ আপনার নজর এসে পড়ে আমার ওপর। লোকে আমাকে সুন্দরীই বলে থাকে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় দু-একজন ফিল্ম ডিরেকটর তাদের ছবিতে হিরোইন করার জন্যে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত হানা দিয়েছিল। মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার উইকনেস আর লোভের তো শেষ নেই। আমাকে দেখেই আগের প্ল্যানটা আপসেট হয়ে যায়। আপনি বাবা আর দাদাদের নতুন করে প্রোপোজাল দেন। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে সাড়ে চার লাখ টাকা ছেড়েও দিতে পারেন।'

ভীষণ অস্বস্তি হতে থাকে সিতাংশুর। জিভ দিয়ে শুকনো খসখসে ঠোঁট দুটো চেপে অস্পষ্ট গলায় সে কী বলে, বোঝা যায় না।

অদিতি বলে, 'কী হল, উত্তর দিন।'

সিতাংশু চুপ।

অদিতি এবার বলে, 'আপনি যখন কিছু বলছেন না তখন ধরে নিতে হবে আমার অনুমানটাই ঠিক।'

সিতাংশু এবারও মুখ বুজে থাকে। তার নাকমুখ ঝাঁ ঝাঁ করে। শরীরের সমস্ত রক্ত একলাফে মাথায় চড়ে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, 'ঠিক আছে। কিন্তু কাজটা আপনি ভাল করলেন না—'

'কতটা ভাল করেছি আর কতটা করা উচিত ছিল, আমি জানি। নাউ

গেট আউট—' বলে সোজা দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

জ্বলন্ত চোখে অদিতিকে দেখতে দেখতে উন্মাদের মতো এলোমেলো পা ফেলে বেরিয়ে যায় সিতাংশু।

পাঁচ

সিতাংশু চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ দু-হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে থাকে অদিতি। সেই বিকেল থেকে একের পর এক বিস্ফোরক ঘটনাগুলি তার শালীনতা ভদ্রতা এবং সুরুচির বোধগুলিকে একেবারে চুরমার করে দিয়েছে। একটু আগে যে ভাষায় সিতাংশুকে সে আক্রমণ করেছে, যেভাবে তাকে বাড়ির বার করে দিয়েছে, এখন সেসব ভাবতে গিয়ে এক ধরনের গ্লানি বোধ করতে থাকে। পরক্ষণেই মনে হয়, এটা না করে তার উপায়ই বা কী ছিল? লোকজন ডেকে ওই লোকটাকে ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে এবং বেদম মারতে মারতে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিলেই ভাল হত। সেটাই ছিল তার উপযুক্ত পুরস্কার। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি রয়েছে তার, একটা নাম-করা কলেজের সে অধ্যাপিকা। অদিতির যা শিক্ষাদীক্ষা এবং রুচি তাতে একটা বিশেষ লেভেলের নিচে তার পক্ষে নামা অসম্ভব।

সিতাংশু চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ দু আঙুলে কপালের দু পাশের রগ টিপে ধরে বসে থাকে অদিতি। মাথার ভেতর এখন রক্ত টগবগ করে ফুটছে। একসময় উত্তেজিত স্নায়ুগুলো জুড়িয়ে এলে আস্তে আস্তে ড্রইং-রুম থেকে বেরিয়ে বাইরের প্যাসেজে চলে আসে সে। আর তখনই দেখতে পায় দশ ফিট দূরত্বে ওপরে ওঠার সিঁড়িটার মুখে দাঁড়িয়ে আছে বরুণ এবং মৃগাঙ্ক। অবশ্য রমাপ্রসাদ আশেপাশে কোথাও নেই।

সিতাংশুর সঙ্গে কথা বলার সময়ই অদিতির মনে হয়েছিল, কাছাকাছি কোথাও রয়েছে বরুণেরা। তার ধারণা যে আগাগোড়া নির্ভুল, হাতেনাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সে চোখ বুজে বলে দিতে পারে, সিতাংশুর সঙ্গে তার যা যা আলোচনা হয়েছে—সবটাই বরুণেরা শুনেছে। কেননা এই আলোচনার ওপর তাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে।

সিতাংশুর সঙ্গে যে ব্যবহার অদিতি করেছে তাতে বরুণদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবার কথা। তার প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই আন্দাজ করা যাচ্ছে। রাগে এবং হতাশায় দাদারা এবং বাবা নিশ্চয়ই বারুদের মতো হয়ে আছে। অদিতি মনে মনে স্থির করে ফেলে, বরুণেরা যদি কিছু বলে সে উপযুক্ত জবাব দেবে, তাদের সহজে ছাড়বে না। তাকে বিক্রি করে দেবার অধিকার ওদের নেই।

সিঁড়ির কাছে এসে বরুণ এবং মৃগাঙ্ককে ভাল করে লক্ষ করতেই চমকে·

ওঠে অদিতি। দুই ভাইয়ের চোখে এই মুহূর্তে মারাত্মক দৃষ্টি।

যতই সাহসী আর জেদী হোক, অদিতি একটি মেয়ে। প্রথমটা ভয় পেয়ে যায় সে। পরক্ষণেই স্বয়ংক্রিয় কোনো পদ্ধতিতে নিজের মধ্যে অদম্য এক দৃঢ়তা অনুভব করে। দুই ভাইকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। বরুণদের পার হয়ে যাবার পর পেছনে না ফিরেও অদিতি টের পায় ভাইদের চোখ থেকে আগুন ঝরছে।

দোতলায় ল্যান্ডিং-এর কাছে আসতে দেখা গেল ওধারের বিশাল বারান্দায় মাথায় হাত দিয়ে একটা চেয়ারে ঘাড় গুঁজে বসে আছেন রমাপ্রসাদ। তাঁর পাশে হেমলতা। চিরদিনের ভীরু মাকে এই মুহূর্তে আরও শঙ্কিত এবং সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে। একটু দূরে শ্বাসরুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে দুই বৌদি—বন্দনা আর মীরা। ওদের দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে, এইমাত্র এই বাড়িতে কোনো মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে গেছে।

ভয়ে ভয়ে হেমলতা ডাকেন, 'বুবু, এদিকে আয়—'

সিঁড়ি দিয়ে তেতলার দিকে উঠতে উঠতে অদিতি বলে, 'শাড়ি-টাড়ি পাল্টে আসছি মা।' 'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে চাঁপাকে রেখে আসার পর পোশাক-টোশাক বদলাবার সময় পাওয়া যায়নি। সারাদিনের ধুলোবালি ঘাম আর পোড়া গ্যাসোলিনের ধোঁয়ামাখা শাড়ি-ব্লাউজ গায়ে জড়িয়ে আছে। ওগুলো না ছাড়া পর্যন্ত বিশ্রী লাগছে অদিতির। ক্লান্তিও বোধ করছে যথেষ্ট। এখন স্নানটা করে নিতে পারলে নিজেকে অনেকখানি টাটকা লাগত কিন্তু যেভাবে মা-বাবা অপেক্ষা করছেন, তাতে সময় পাওয়া যাবে কি?

তেতলায় উঠতেই কোত্থেকে দুর্গা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। বলে, 'পিসিমা তোমাকে ডাকছে ছোটদি—'

অদিতি ঠিকই করে রেখেছিল, সবার আগে মৃণালিনীর সঙ্গে দেখা করে সিতাংশুর সঙ্গে তার যা যা কথা হয়েছে, জানাবে। সে বলে, 'পিসিকে বল দশ মিনিটের ভেতর আসছি।'

মৃণালিনীর ঘরের ডানপাশে অদিতির ঘর। সোজা সেখানে চলে আসে সে।

ঘরটার মাঝখানে সিঙ্গল-বেড খাটে ধবধবে বিছানা। একধারে জানালা ঘেঁষে লেখাপড়ার জন্য টেবল-চেয়ার। আরেক দিকের গোটা দেয়াল জুড়ে পর পর অনেকগুলো আলমারি। সেগুলো বইয়ে ঠাসা। তৃতীয় দেয়ালের গায়ে নিচু নিচু র‍্যাক। সেগুলোও ভর্তি হয়ে বই উপচে পড়ছে। এমন কি মেঝেতেও প্রচুর ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ, প্যামফ্লেট ডাঁই হয়ে আছে। অন্য এক দেয়ালে ছোট একটা ড্রেসিং টেবল, জামা কাপড়ের আলমারি। এ বাড়ির আর সব ঘরের মতো এ'ঘরেও অ্যাটাচড বাথরুম।

আলমারি থেকে কাচানো শাড়ি জামা-টামা বার করে বাথরুমে ঢুকে পড়ে

অদিতি। দ্রুত মুখ-টুক ধুয়ে, পোষাক বদলে ঠিক দশ মিনিটের ভেতর মৃণালিনীর ঘরে চলে আসে। এখন স্নানটা করা হল না। পরে খাওয়ার আগে করে নেবে।

মৃণালিনী প্রায় দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলেন। হাত বাড়িয়ে অদিতিকে তার পাশে বসিয়ে বলেন, 'কী কথা হল ঐ বদমাসটার সঙ্গে?' তাঁর চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে অসীম ব্যগ্রতা এবং উৎকণ্ঠা, 'ওদের ফাঁদে পা দিসনে তো?'

অদিতি হাসে, 'না পিসি।' তারপর বাবা এবং দাদাদের ড্রইং-রুম থেকে বার করে দিয়ে সিতাংশুর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছে, সংক্ষেপে জানিয়ে দেয়।

'ঠিক বলেছিস।' মৃণালিনীর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে থাকে, 'আমার এই অবস্থা! বিছানায় পড়ে না থাকলে আমি নিজেই পশুটাকে যা বলার বলতাম। তোকে ওর কাছে যেতে দিতাম না। তা হ্যাঁ রে—'

'বলো—'

'তোর বাপ আর দাদারা ওদের শয়তানিটা কাঁচিয়ে দেবার পর কিছু বলেনি তোকে?'

'এখনও বলেনি। তবে সবাই আমার জন্যে বন্দুকে গুলি পুরে ওয়েট করছে। একবার গেলেই হয়—'

'আমি তোর বাপ-দাদাদের হাড়ে হাড়ে চিনি। একেকটা ধড়িবাজ, অপদার্থ, কুলাঙ্গার। নিজেদের কানাকড়ি রোজগারের ক্ষমতা নেই। স্বার্থের জন্যে তোকে জলে ভাসিয়ে দিতে চাইছে।' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ধারাল হয়ে ওঠে মৃণালিনীর, 'হয়ত ওরা রাগারাগি কিংবা কাকুতি-মিনতি করে এ বিয়েতে তোকে রাজী করাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ওদের কোনো কথা শুনবি না।'

মৃণালিনী যে তার কতবড় হিতাকাঙ্ক্ষী, অদিতি নতুন করে আবার অনুভব করে। রমাপ্রসাদদের স্বার্থের কারণে তার জীবন, তার ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য তাঁর দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের শেষ নেই। যতই অসুস্থ আর শয্যাশায়ী হোক, এমন একজন মানুষ পাশে থাকলে অনেক ভরসা পাওয়া যায়। অদিতি বলে, 'তুমি ভেবো না পিসি।'

'খাওয়া-দাওয়া তো হয়নি?'

'না।'

'বাবা আর দাদাদেব সঙ্গে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে খেয়ে নিবি।'

'আচ্ছা—'

'ওরা কি বলে আমাকে জানিয়ে যাবি।'

'আচ্ছা—' বলতে বলতে অদিতি উঠে পড়ে, 'জানো পিসি, আজ 'নারী—

জাগরণ'-এর কাজে একটা বস্তিতে গিয়ে দারুণ ব্যাপার ঘটে গেছে। ফিরে এসে তোমাকে বলব।'

'নারী-জাগরণ'-এর কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল উৎসাহ মৃণালিনীর। আবহমানকাল এ দেশের মেয়েরা লাঞ্ছিতা হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে এখানে নারীর অসম্মান। প্রতিদিন এখানে নারী হত্যা, নারী নিগ্রহ। নিজের জীবনেও তো কম বিপর্যয় ঘটে যায়নি। এককভাবে তিনি পঞ্চাশ বছর আগে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এখনও মেয়েদের ওপর অন্যায় অবিচার সমানে চলছে। বরং মাত্রাটা আরো বেড়ে গেছে। এ সবের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করেছে 'নারী-জাগরণ'। মৃণালিনী মনে মনে নিজেকে এই যুদ্ধের একজন সৈনিক মনে করেন। তাঁর আক্ষেপ, পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হচ্ছে, নইলে বাকি জীবনটা 'নারী-জাগরণ'-এর কাজেই কাটিয়ে দিতেন।

ঘর থেকে বেরুতে না পারলেও অদিতি রাত্তিরে বাড়ি ফিরলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর নেন মৃণালিনী। 'নারী-জাগরণ'-এর মেম্বাররা মেয়েদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রায় রোজই হয় মিছিল বার করে, নইলে স্ট্রিট কর্নার মীটিংয়ে বক্তৃতা দেয়, কিংবা সমাজের নানা স্তরের লোকজন ডেকে এনে সেমিনারে বসায়। মিছিলে কী হল, কে কী বক্তৃতা দিল—সমস্ত কিছু না জানা পর্যন্ত তাঁর ঘুম আসে না। অনেক সময় আন্দোলন কিভাবে চালানো হবে তার সঠিক পরামর্শও দেন। 'নারী-জাগরণ'-এর মেম্বাররা তাঁর সম্বন্ধে অদিতির কাছে সব শুনেছে। ওরা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করে। ওদের দুঃখ এমন একটি মানুষকে সহযোদ্ধা হিসেবে সর্বক্ষণ পাশে পাওয়া যায় না। যদি সক্রিয়ভাবে মৃণালিনী সঙ্গে থাকতেন তাদের আন্দোলন অনেক বেশি জোরালো হত।

'নারী-জাগরণ'-এর খবর তো আছেই, তাছাড়া রাস্তায় চলতে ফিরতে অদিতি কী দেখল, কার সঙ্গে কী কথা হল, কলেজে গিয়ে কটা ক্লাশ নিল, ইত্যাদি সব জানা চাই মৃণালিনীর।

আসলে অদিতি আর দুর্গা ছাড়া তাঁর ঘরে এ বাড়ির কেউ বিশেষ আসে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মাথার দিকের জানালা দিয়ে আকাশের একটা টুকরো, বাড়ির সামনে ঝোপঝাড়ে বোঝাই খানিকটা জমি, ভাঙা গেটের বাইরে পীচের রাস্তা, রাস্তার ওধারে দুচারটে বাড়ি-টাড়ি দেখা ছাড়া এই শহরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এর বাইরে বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে যে সামান্য যোগাযোগটুকু এখনও বজায় আছে তা অদিতির জন্যই। প্রতিদিন রাত্তিরে নানা মানুষ এবং অসংখ্য ঘটনার খবর এনে অদিতি পঙ্গু শরীরের ভেতরে তাঁর উন্মুখ অস্থির মনকে সতেজ করে তোলে।

মৃণালিনী বলেন, 'আচ্ছা, যা—'

দোতলায় নেমে এসে অদিতি দেখতে পায় দুই বৌদি, মা আর বাবা অবিকল আগের মতোই দাঁড়িয়ে, বসে আছে বা যেন সিনেমার ফ্রিজ শট। এবার অবশ্য দাদারাও আছে। সে যখন তেতলায় ছিল তখন বরুণরা নিচের সিঁড়ি থেকে উঠে এসেছে।

অদিতি লক্ষ করে, মা ছাড়া সবার চোখে-মুখেই অদ্ভুত এক কাঠিন্য আর নিষ্ঠুরতা ফুটে রয়েছে। বোঝা যায়, এরা তাকে সহজে ছাড়বে না। অদিতি নিজের স্নায়ুগুলোকে টান টান রেখে সতর্ক ভঙ্গিতে অপেক্ষা করতে থাকে। যে কোনো যুদ্ধের জন্য সে-ও প্রস্তুত।

আচমকা বরুণ চিৎকার করে ওঠে, 'আমাদের এভাবে অপমান করার মানে কী?'

পাল্টা চেঁচিয়ে উঠতে পারত অদিতি। কিন্তু তার রুচি অন্য রকম, বাবা এবং দাদাদের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। খুব সংযত গলায় বলে, 'এই প্রশ্নটা তো আমার করার কথা।'

বরুণ একটু থতিয়ে যায়। সে জানে অদিতি যা বলেছে তার শতকরা একশ ভাগ ঠিক। কিন্তু সিতাংশুর সঙ্গে তাদের জীবন-মরণ সমস্যা জড়িয়ে আছে। এখন পিছু হটা চলবে না। গলার স্বরটা আগের চড়া পর্দায় রেখে বলে, 'কী বলতে চাস তুই?'

'বলতে চাই, একটা ডিবচ বদমাস স্কাউন্ড্রেলকে তোমরা আমার কাঁধে চাপিয়ে দেবার জন্যে বাড়ির ভেতর নিয়ে এসেছ। আমাকে কোন লেভেলে নামাতে চাইছ, ভাল করে ভেবে দেখেছ?'

রমাপ্রসাদ এইসময় চড়া গলায় বলেন, 'সিতাংশু একজন 'রেসপেক্টেবল বিজনেসম্যান। তার সম্বন্ধে ভদ্রভাবে কথা বল—'

মৃগাঙ্ক ভয়ানক উত্তেজিত হয়েছিল। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'একজ্যাক্টলি।'

সোজা রমাপ্রসাদের চোখের দিকে তাকিয়ে অদিতি বলে 'রেসপেক্টেবল! যার দু-দুটো স্ত্রী ডিভোর্স করে চলে গেছে, একটা স্ত্রী মার্ডার্ হয়েছে—'

মৃগাঙ্ক মাঝখান থেকে গলা চড়িয়ে বলে, 'কে বললে মার্ডার? হঠাৎ আগুন লেগে মারা গেছে। ইটস্ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। সবাই সে কথা জানে। খবরের কাগজেও বেরিয়েছে।'

'কোনটা অ্যাকসিডেন্ট আর কোনটা মার্ডার, সেটুকু বুঝবার মতো বয়স এবং বিদ্যাবুদ্ধি আমার হয়েছে। কোনো সাফাই গাইবার দরকার নেই।' অদিতি ঘুরে মৃগাঙ্কর দিকে তাকায়।

বরুণ ওধার থেকে বলে ওঠে, 'মার্ডার হলে কোর্টে কেস উঠত না? আইন ওকে ছেড়ে দিত?'

অদিতি এবার বরুণের দিকে ফিরে দাঁড়ায়, ঈষৎ তীক্ষ্ম গলায় 'বলে, 'আইন !'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আইন !'

'এই দেশের মানুষ হয়েও তুমি আসল খবরটা জানো না ! না, ইচ্ছে করে না জানার ভান করছ !'

বরুণ সামান্য থতিয়ে যায়, 'মানে !'

অদিতি বলে, 'তোমাদের ওই সিতাংশুও আইন, কোর্ট—এসব কথা বলেছিল। কিন্তু টাকা থাকলে পাঁচটা খুন করেও যে পার পাওয়া যায়, সেটা তোমার নিশ্চয়ই অজানা নেই।' তীব্র বিদ্রূপে তার ঠোঁট বেঁকে যায়।

বরুণ পলকের জন্য থমকে যায়। পরক্ষণেই গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে দেয়, 'আমি জানি সিতাংশু সম্পর্কে কে এই স্ক্যান্ডাল রটাচ্ছে। তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেব।'

রমাপ্রসাদ শাণিত গলায় বলেন, 'সেই যে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসল, তারপর থেকে সারাটা জীবন জ্বালিয়ে যাচ্ছে। এবার আমি আর বরদাস্ত করব না, সহ্যের সীমা একেবারে পার হয়ে গেছে।'

মৃগাঙ্ক বলে, 'বাবা, পিসি এ বাড়িতে থাকলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি কিছু একটা ব্যবস্থা কর। আমাদের খাবে, আর দিনরাত আমাদেরই ক্ষতির মতলব করবে, এটা কিছুতেই হতে দেব না। একটা উইচ—'

নিজের অজান্তেই অদিতির মুখ শক্ত হয়ে ওঠে, 'ছোটদা, সব 'ব্যাপারের একটা লিমিট আছে, তুমি সেটা ছাড়িয়ে গেছ। যে ভাষাটা নিজের পিসি সম্পর্কে উচ্চারণ করলে তাতে সন্দেহ হয় ভদ্রবংশে জন্মেছ কিনা।

'যে আমাদের ক্ষতি করবে তার সঙ্গে কিসের ভদ্রতা !' মৃগাঙ্ক রুখে ওঠে।

তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অদিতি রমাপ্রসাদের দিকে ফিরে বলতে থাকে, 'বাবা, পিসি আমার ওয়েল-উইশার, তাই আগে থেকে ঐ ডিবচ বদমাসটার সম্পর্কে ওয়ার্নিং দিয়েছে, তোমাদের একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, এ বাড়ির একটা অংশ পিসিরও। তাকে তাড়াবার চেষ্টা করলে ফলাফল মারাত্মক হবে। আমি কিন্তু কাউকে ছেড়ে দেব না।' বলতে বলতে মৃগাঙ্কর দিকে আবার ফেরে সে, 'জীবনে নিজে ক-পয়সা রোজগার করেছ যে পিসিকে খাওয়াবার কথা বললে ! পিসির সমস্ত খরচ আমি দিয়ে থাকি। পিসি এতদিন চাকরি করেছে। তারও টাকা আছে। সে তোমাদের ওপর ডিপেন্ড করে নেই। ডোন্ট ফরগেট ইট।'

'শাট আপ—' গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে মৃগাঙ্ক।

'তোমার ভয়ে ? অনেস্টলি যে একটা পয়সা রোজগার করতে পারেনি,

গ্যাম্বলিং যার একমাত্র প্রফেসান, তার মতো ডার্টি, বাজে লোকের ধমকে আমাকে চুপ করে যেতে হবে?'

মৃগাঙ্ক হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো অদিতির ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে রমাপ্রসাদ বলেন, 'বাবলু, তুই এখান থেকে যা। যা বলার আমি বুবুকে বলছি।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে আর দাঁড়ায় না মৃগাঙ্ক। হিংস্র চোখে অদিতিকে দেখতে দেখতে দুমদাম পা ফেলে ওধারের একটা ঘরে গিয়ে ঢোকে।

রমাপ্রসাদ এবার তাঁর স্ট্রাটেজি বদলে ফেলেন। ভয় দেখিয়ে চড়া মেজাজে তাঁর এই একগুঁয়ে জেদী মেয়েটিকে কোনোভাবেই বাগ মানানো যাবে না। তাঁকে এগুতে হবে সুকৌশলে, ঠাণ্ডা মাথায়। মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, তার সেণ্টিমেণ্টকে উসকে দিয়ে কাজ গুছোতে হবে।

শান্ত সস্নেহ ভঙ্গিতে রমাপ্রসাদ বলেন, 'রাগারাগি, হইচই করে কিছু লাভ আছে? তুই আমার কাছে এসে বস। আয়—'

এটা বাবার যে একটা চতুর চাল, বুঝতে অসুবিধে হয় না অদিতির। তবু দেখাই যাক রমাপ্রসাদ তার জন্য ফাঁদটা নতুন করে কিভাবে সাজান। সে সতর্ক আছে। ওঁদের মতলব যখন জানাই গেছে তখন তাকে বিপাকে ফেলা খুব সহজ হবে না। অদিতি পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে বাবার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ে। বলে, 'কী বলবে বল।'

মেয়ের কাঁধে গভীর স্নেহে একটা হাত রেখে ভারি নরম গলায় রমাপ্রসাদ বলেন, 'আমি তোর বাবা আর ওরা তোর ভাই তো?'

একটু অবাক হয়েই অদিতি বলে, 'হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

'আছে আছে, কারণ আছে। তুই আমাদের শত্রু ভাবিস, তাই কথাটা বলতে হল।'

বাবার কৌশলটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। উত্তর না দিয়ে রমাপ্রসাদকে স্থির চোখে লক্ষ করতে থাকে অদিতি।

রমাপ্রসাদ এবার বলেন, 'মিনুর মতো আমরা যে তোকে ভালবাসি, এটা নিশ্চয়ই মানিস।'

অদিতি এবারও চুপ করে থাকে।

রমাপ্রসাদ আবার বলেন, 'মিনু ঘর থেকে বেরুতে পারে না। ওকে নিশ্চয়ই কেউ সিতাংশু সম্পর্কে উল্টোপাল্টা খবর দিয়ে গেছে। তাই শুনে ও একটা খারাপ ধারণা করে নিয়েছে। আমি বলছি, সিতাংশু খুব ভাল ছেলে—জেম অফ এ বয়।'

এবার বাবার ধূর্ত চাল যেন খানিকটা স্পষ্ট হচ্ছে। অদিতির মুখে সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়।

রমাপ্রসাদ চোখের কোণ দিয়ে মেয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে বলেন, 'বিরাট কনস্ট্রাকসনের ফার্ম ওর। লাখ লাখ টাকা ইনকাম। আমি বলছি, এ বিয়ে হলে তুই সুখে থাকবি।'

'সিতাংশু তার টাকা পয়সার কথা আমাকে বেশ ভাল করেই জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাবা—'

'কী?'

'আমি তো ঐ লোকটাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছি।'

রমাপ্রসাদ হঠাৎ আশান্বিত হয়ে ওঠেন। ভাবেন, এটা বুঝি অদিতির রাজী হওয়ার লক্ষণ। স্নিগ্ধ গলায় বলেন, 'সে জন্যে তুই ভাবিস না। আমি গিয়ে বোঝালে এ ব্যাপারটা ও আর মনে রাখবে না।'

'এত ইনসাল্টের পরেও?'

তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে রমাপ্রসাদ বলেন, 'দূর, ইনসাল্ট আবার কী। সামান্য একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। ওরকম অনেক হয়। তা হলে কালই ওদের বাড়ী যাই?' তাঁর আর তর সইছিল না।

অদিতি হাত তুলে বলে, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, আরও কিছু কথা তোমার সঙ্গে বাকি আছে।'

'কী রে?'

'বড়দা ছোটদা আর তুমি তিনজনে সিতাংশু ভৌমিকের কাছ থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা ধার নিয়েছ—এটা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবে না।'

রমাপ্রসাদ ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। বলেন, 'হ্যাঁ। মানে শেয়ার মার্কেটের ব্যাপারে—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে যান।

অদিতি বলে, 'তুমি শেয়ার মার্কেটে ফাটকাবাজি করে আর দাদারা জুয়া রেস, এই সব করে টাকাটা উড়িয়ে দিয়েছ। আমার সঙ্গে সিতাংশু ভৌমিকের বিয়ে হলে টাকাটা আর ফেরত দিতে হবে না, কি বল?'

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন রমাপ্রসাদ।

অদিতি বলতে থাকে, 'তার মানে সাড়ে চার লাখ টাকায় তোমরা আমাকে একটা বজ্জাতের কাছে বেচে দিতে চাইছ!'

রুদ্ধ গলায় রমাপ্রসাদ বলেন, 'কী যা তা বলছিস বুবু! আমি তোর বাবা—'

তাঁকে শেষ করতে দেয় না অদিতি। তীক্ষ্ন গলায় বলে, 'এখানেই তো আমার অদ্ভুত লাগছে। তোমরা শেষ পর্যন্ত আমাকে একটা প্রপার্টি ভাবছ, টাকার বদলে একটা বদ লোকের হাতে তুলে দিতে চাইছ। কিন্তু তা হবে না। আর—'

হঠাৎ ভীষণ অসুস্থবোধ করেন রমাপ্রসাদ। তাঁর হাত-পায়ের জোড় যেন আলগা হয়ে যেতে থাকে। শিথিল গলায় কোনোরকমে বলেন, 'আর কী?'

'তোমরা যদি ভেবে থাক, তোমাদের ধার শোধ করার জন্যে সিতাংশু ভৌমিককে এই বাড়ি বেচে দেবে, তা আমি কিছুতেই করতে দেব না। তোমরা জুয়া ফাটকা খেলে টাকা ওড়াবে, আর তার জন্যে বাকি সকলে পথে বসবে, সেটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। দাদুর উইল আমি দেখেছি। এ বাড়ি বিক্রি করা যাবে একটি মাত্র কন্ডিশানে। বিক্রির সময় এই ফ্যামিলির যারা বেঁচে থাকবে তাদের সবার কনসেন্ট না পাওয়া গেলে কেউ বাড়ি বিক্রি করতে পারবে না। দু-একজনের খামখেয়ালিতে পারিবারিক প্রপার্টি নষ্ট করে আমাদের কিছুতেই পথে বসানো চলবে না।'

রমাপ্রসাদ চমকে ওঠেন। তাঁর আর্থরাইটিসের কষ্টটা হঠাৎ চিড়িক মেরে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সামলাতে সামলাতে কাতর গলায় বলেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'বাড়িঘর বা আমাদের ধারদেনার কথা থাক।'

সুরহীন ভারী গলায় অদিতি বলে, 'কেন থাকবে? ওটা ভীষণ ভাইটাল ব্যাপার। তুমি আমাকে একটা কথা পরিষ্কার করে বল তো—'

শঙ্কিত মুখে রমাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করেন, 'কী কথা?'

তোমাদের কাছে দেবদূতের মতো যে সিতাংশু নেমে এসেছে সে আমাকে জানিয়েছে ধারের টাকা আদায় করতে না পারলে সে ছাড়বে না। স্কাউন্ড্রেলটা তখন এই বাড়িটা লিখিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমরা কেউ সই দিচ্ছি না। বিশেষ করে পিসি। এখন তোমরা কি করবে?'

'আঃ, বাড়িটাড়ির আলোচনা এখন থাক। তোর সম্বন্ধে আমার একটা কর্তব্য আছে।'

রমাপ্রসাদ ঠিক কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'কোন কর্তব্যের কথা বলছ?'

রমাপ্রসাদ বলেন, 'তোর তো এবার বিয়ে দেওয়া দরকার।'

কর্তব্যের ছদ্মবেশে রমাপ্রসাদ কী ধরনের তুখোড় চাল দিতে চাইছেন, ধরতে চেষ্টা করে অদিতি। হঠাৎ তার মনে হয়, রমাপ্রসাদ বুঝে ফেলেছেন সিতাংশুর সঙ্গে তার বিয়ে কোনোভাবেই ঘটাতে পারবেন না। তাই কি এ বাড়ি থেকে তাকে কৌশলে বার করে দিতে চাইছেন? সে এখানে থাকলে বাড়ি বিক্রির কনসেন্ট সবার কাছ থেকে সহজে আদায় করা যাবে না। অথচ এটা না বেচলে ঋণ শোধ করা অসম্ভব। ওদিকে টাকা ফেরত না পেলে সিতাংশু কিছুতেই ছাড়বে না। এতগুলো টাকা নিঃস্বার্থভাবে দান খয়রাত করার মতো মানুষ আর যেই হোক, সিতাংশু নয়।

অদিতি বলে, 'বাবা, যে মেয়েদের পক্ষে বিয়েটা ভীষণ জরুরি, আমি কিন্তু তাদের মধ্যে পড়ি না। আমি মোটামুটি একটা চাকরি করি। আমি

কারও ঘাড়ের ওপর বোঝা হয়ে নেই। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'বিয়ে সম্পর্কে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই। পিসি আর দিদির বিয়ের কী রেজাল্ট হয়েছে, ভাবলে মনে হয় এ দেশের মেয়েদের চিরদিন কুমারী থাকা ভাল।'

এতক্ষণ হেমলতা রমাপ্রসাদের পেছনে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটি কথাও বলেননি। এবার শ্বাসরুদ্ধের মতো বলেন, 'বুবু, দেশাচার বলে একটা কথা আছে, সেটা কি না মানলে চলে?'

রমাপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ সায় দেন, 'ঠিকই তো। মেয়েরা যতই লেখাপড়া শিখুক, যতই রোজগার করে স্বাবলম্বী হোক, তার বিয়ে না দিলে মা-বাপকে লোকের কাছে অনেক কথা শুনতে হয়।'

অদিতি পলকহীন রমাপ্রসাদকে দেখতে দেখতে বলে, 'কে কী বলল, সে সব আমি গ্রাহ্য করি না।' একটু থেমে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে, 'আচ্ছা বাবা, তোমরা কি বিয়ের নাম করে আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়াতে চাইছ?'

কোমরে হাত চেপে দ্রুত খাড়া হয়ে বসেন রমাপ্রসাদ। বলেন, 'মানে?'

'আমি এখান থেকে চলে গেলে অন্যের ওপর প্রেসার দিয়ে বাড়ি বিক্রির কনসেন্ট আদায় করা অনেক সহজ হয়।'

রমাপ্রসাদের মুখচোখ করুণ দেখায়। বিমর্ষ গলায় তিনি বলেন, 'তুই আমাকে কী ভাবিস বুবু? আমি এতটাই নিচে নেমে গেছি!'

তাঁর কথায় কতটা আন্তরিকতা এবং কতটা অভিনয়, অদিতি বুঝতে পারে না। সে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তের মতো বলে, 'ঠিক আছে, বাড়ি বেহাত না হলেই ভাল। তোমরা টাকা ধার করেছ, কিভাবে শোধ করবে, তোমরাই সেটা ভেবো।'

হেমলতা বলেন, 'কিন্তু তুই কি বিয়ে করবি না বুবু?'

একটু চুপ করে থাকে অদিতি। তারপর খুব আস্তে বলে, 'বিয়ে করব না, এমন প্রতিজ্ঞা তো করিনি মা, নিশ্চয়ই করব। আর—'

'আর কী?'

খানিক ইতস্তত করে অদিতি। বলা উচিত হবে কিনা, ভাবতে কিছুক্ষণ সময় নেয়। তারপর মনস্থির করে ফেলে। এই হচ্ছে উপযুক্ত মুহূর্ত। সে বলে, 'আমার বিয়ের জন্যে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।'

একটু চমকে ওঠেন হেমলতা। উত্তেজনা, বিস্ময়, রাগ—যা-ই হোক না কেন, তাঁর কণ্ঠস্বর নিচু পর্দা থেকে ওপরে ওঠে না। তিনি মৃদু গলায় বলেন, 'আমরা চিন্তা না করলে বিয়েটা হবে কী করে?'

'ও ব্যাপারে আমি ভেবেছি। পরে তোমাদের জানাব।'

মৃগাঙ্ক স্নায়ুগুলো টান টান করে অদিতিকে লক্ষ করছিল। এবার সে

বলে, 'তুই কি বিকাশকে বিয়ে করবি বলে ঠিক করেছিস ?'

মৃগাঙ্কর দিকে মুখ ফেরায় অদিতি। সে কখন যে আবার ফিরে এসেছে, বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে টের পাওয়া যায়নি। অদিতি শান্ত গলায় বলে, 'একটু ধৈর্য ধর, পরে জানতে পারবে।'

মৃগাঙ্ক অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ গলায় বলতে থাকে, 'নতুন করে জানাবার আর কিছু নেই। আমি সবই জানি। নিজের চোখে কতদিন দেখেছি ঐ ছোকরার সঙ্গে ট্যাং ট্যাং করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। শুধু আমি একাই না, আমার বন্ধুরাও দেখে যা তা বলে।'

সিতাংশুর সঙ্গে বোনের বিয়ের পরিকল্পনাটা যে কেঁচে গেছে সেটা বুঝতে পেরে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে মৃগাঙ্ক। নিষ্ফল আক্রোশে তাই যা খুশি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। অসহ্য রাগে মাথার ভেতর শিরা ছিঁড়ে যায় যেন অদিতির। ভাবে, চিৎকার করে উঠবে। কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে কোনোরকম বিস্ফোরণ ঘটতে দেয় না।

মৃগাঙ্ক থামেনি, 'ছোকরার কোনো ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। শুনেছি থাকার মধ্যে ভবানীপুরের থার্ড ক্লাশ গলির ভেতর পুরনো ভাঙাচোরা ছোট একটা বাড়ি। তা-ও একার না, ভাগের বাড়ি। এরকম একটা —'

অদিতি আঙুল উঁচিয়ে মৃগাঙ্ককে থামিয়ে দেয়। গম্ভীর মুখে বলে, 'ছোটদা, আমি বাচ্চা মেয়ে নই। আমি কাকে বিয়ে করব, না করব, এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আর বিকাশ অত্যন্ত শিক্ষিত একজন ভদ্রলোক। তার সম্মান রেখে কথা বলবে।' সে আরও বলতে যাচ্ছিল, বিকাশ আর যাই হোক মৃগাঙ্কর মতো রেস বা জুয়ায় সর্বস্ব উড়িয়ে দেয় না। কী ভেবে শেষ পর্যন্ত আর বলে না।

মৃগাঙ্ক ভেংচে ওঠে, 'ভদ্রলোক! শিক্ষিত! আমি—'

তাকে শেষ করতে দেন না রমাপ্রসাদ। বলেন, 'বাবলু, এত রাতে এরকম চেঁচামেচি আমার ভাল লাগছে না। আই ফীল টোটালি একঝস্টেড।'

'ঠিক আছে—' মৃগাঙ্ক আর দাঁড়ায় না, উত্তেজিত ভাবে পা ফেলে ফেলে উত্তর দিকের একটা ঘরে গিয়ে ঢোকে।

দশ ফিট দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল মীরা। সে চাপা গলায় বলে, 'নিজের বিয়ের ব্যাপারে বাপ আর বড় ভাইদের সঙ্গে কোনো মেয়েকে এভাবে কথা বলতে আগে আর দেখেনি। নির্লজ্জ কোথাকার।'

তীব্র মোচড়ে শরীরটা মীরার দিকে ঘুরে যায় অদিতির। ভেবেছিল, কোনো প্ররোচনাতেই সে উত্তেজিত হবে না বা ধৈর্য হারাবে না। কিন্তু এখন আর মাথাটা একেবারেই ঠাণ্ডা রাখা যাচ্ছে না। তীক্ষ্ন গলায় সে বলে, 'তোমার চেয়েও আমি বেশি নির্লজ্জ!'

অদিতির মতো শান্ত সংযত মেয়ে এভাবে মারমুখী ভঙ্গিতে রুখে উঠবে

ভাবতে পারেনি মীরা। সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। দমবন্ধ গলায় বলে, 'আমি—আমি—আমি—'

আজ প্রায় সারাটা দিন অদিতির ওপর দিয়ে যা গেছে তাতে তার মতো ভদ্র ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে বলেই এতক্ষণ হইচই বাধায়নি। কিন্তু এখন সে যেখানে পৌঁছে গেছে সেখান থেকে নিজেকে ফেরানো যায়? আগুনের হলকার মতো তার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে, 'আমি তো বাবা আর দাদাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। বিয়ের আগে তুমি এ বাড়িতে কীভাবে এসে উঠেছিলে, মনে আছে?'

অদিতির ইঙ্গিতটা মারাত্মক। বিয়ের আগে পেটে বাচ্চা নিয়ে মীরা যে এখানে চলে এসেছিল সেটাই নতুন করে জানিয়ে দিয়ে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় তার। নিজের সুরুচি, সংযত ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে খানিকটা চাপা গর্ব তার আছে। সেটা অবশ্য কখনও ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করে না। ভাবে রাগের মাথায় মীরাদের লেভেলে নেমে যাওয়া ঠিক হয়নি।

মীরা আকস্মিক আঘাতে প্রথমটা ভীষণ ঘাবড়ে যায়। তারপর আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে প্রায় টলতে টলতে উত্তর দিকে তার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

কিছুক্ষণের জন্য গোটা বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে থাকে। এমন রূঢ়তা খুব সম্ভব অদিতির কাছ থেকে কেউ আশা করেনি।

তারপর হেমলতা বলেন, 'অনেক রাত হল। সবাই এবার খেয়ে নেবে চল।' তিনি ভীরু মানুষ। এই মুহূর্তে ছেলেমেয়ে এবং স্বামীর মধ্যে যা হয়ে গেল তাতে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। তাঁর নরম ধাতের স্নায়ু এত হইচই, এত উত্তেজনা, এত অশান্তি সহ্য করতে পারছে না। আবার যাতে চিৎকার চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি না বাধে তাই অপ্রিয় প্রসঙ্গটা আপাতত বন্ধ করতে চাইছেন।

বার বার ডাকা সত্ত্বেও বরুণ মৃগাঙ্ক মীরা বা বন্দনা, কেউ খেতে আসে না। মৃগাঙ্কর ছেলে চিকু আর মৃণালিনীকে সন্ধ্যের পরই খাইয়ে দেওয়া হয়। অগত্যা রমাপ্রসাদ হেমলতা আর অদিতি দোতলার একধারে খাবার ঘরে চলে যায়।

খাওয়ার ইচ্ছেটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নিঃশব্দে, পাতের ওপর ঘাড় গুঁজে রুটি তরকারি বা মাংসের ঝোল নাড়াচাড়া করে এক সময় উঠে পড়ে অদিতি। রমাপ্রসাদ এবং হেমলতার হালও একই। কোনোরকমে নিয়মরক্ষাটুকু সেরে প্লেট সরিয়ে বেসিনে মুখ ধুতে চলে যান।

তেতলায় এসে প্রথমেই মৃণালিনীর ঘরে যায় অদিতি।

মৃণালিনী তার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন। বলেন, 'নিচে এত চেঁচামেচি হচ্ছিল কেন রে?'

এই মুহূর্তে একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না অদিতির।

উত্তেজনায় টেনশানে কপালের দুপাশে রক্তবাহী শিরাগুলো দপ দপ করছে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। নেহাত মৃণালিনী তার জন্য জেগে থাকবেন, তাই আসতে হয়েছে।

অদিতি বলে, 'কাল শুনো পিসি। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।'

অদিতির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে চেষ্টা করেন মৃণালিনী। বলেন, 'আচ্ছা, শুয়ে পড় গিয়ে। আমার ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাস।'

অদিতি সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করে দেয়। তারপর বাইরে থেকে দরজাটা টেনে নিজের ঘরে চলে যায়।

ছয়

পরের দিন কলেজে পর পর চারটে ক্লাশ ছিল অদিতির।

একেকটা ক্লাসে প্রায় সত্তর আশিজন মেয়ে। হিন্দি ফিল্মের ভিলেনের মতো গলার স্বর চড়ায় না তুললে লাস্ট বেঞ্চের ছাত্রীরা ক্লাস লেকচার শুনতে পাবে না।

একটানা দুশ মিনিট গলায় ফেনা তুলে চেঁচিয়ে অদিতি যখন কলেজ থেকে বেরুল, চারটে বেজে গেছে। এখন তার মাথা ঝিম ঝিম করছে।

অমিতাদি কাল বলে দিয়েছিলেন, আজ অবশ্যই যেন 'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে চলে আসে। কেননা, কাল ঢাকুরিয়ার বস্তি থেকে চাঁপাকে নিয়ে গিয়ে ওখানে রাখা হয়েছে। তাকে নিয়ে থানায় যাওয়া একান্ত জরুরি।

কলেজটা বড় রাস্তার ওপর। একটা বাস ধরে অদিতি যখন সাউথ ক্যাল-কাটার 'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে পৌঁছায়, সন্ধ্যে হতে খুব দেরি নেই।

কাল বধূহত্যার প্রতিবাদে মিছিল বার করার কারণে প্রায় সব মেম্বারই হাজির ছিল। কালকের মতো অত ভিড় না থাকলেও বেশ কিছু মেম্বারকে আজ দেখা যাচ্ছে।

অমিতাদির ঘরে ঢুকতেই অদিতির চোখে পড়ে দশ বারোজন এখানে রয়েছে। তাদের মধ্যে বিকাশ এবং চাঁপাকেও দেখা যায়। চাঁপা দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে মেঝেতে বসে আছে। বোধহয় নিঃশব্দে কাঁদছেও। তার পিঠ কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে যায় অদিতি।

অদিতিকে দেখে যারা বাইরে ছিল, তারাও এ ঘরে চলে আসে। এতজনের বসার মতো চেয়ার-টেয়ার নেই, বেশির ভাগই দাঁড়িয়ে থাকে।

অদিতি লক্ষ করে, সবার চোখে মুখেই প্রচণ্ড উত্তেজনা। তার ধারণা, সে এখানে আসার আগে মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে। গোটা পরিবেশটাই

ভীষণ থমথমে।

অমিতাদি ভারী গলায় বলেন, 'বসো অদিতি—'

অমিতাদির মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে ছিল কৃষ্ণা। সে উঠে গিয়ে অদিতির জন্য জায়গা করে দেয়। অদিতি বসতেই অমিতাদি বলেন, 'তোমার জন্যেই আমরা ওয়েট করছি। এত দেরি করলে ?'

অদিতি দেরিতে আসার কারণ জানিয়ে বলে, 'এখানে কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে—'

অমিতাদি গম্ভীর মুখে বলেন, 'হ্যাঁ।'

অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে ?'

অমিতাদি বলেন, 'চাঁপাকে নিয়ে খুব আনপ্লেজান্ট ব্যাপার ঘটে গেল একটু আগে।'

ঘরের আবহাওয়া দেখে সেইরকমই কিছু একটা মনে হচ্ছিল অদিতির। ভেতরে ভেতরে বেশ উৎকণ্ঠাই বোধ করে। তবে কোনো প্রশ্ন করে না। সে জানে, সবাই যখন তার জন্য অপেক্ষা করছে, ঘটনাটা তাকে জানানো হবে। অমিতাদির দিকে তাকিয়ে থাকে অদিতি।

অমিতাদি বলেন, 'নগেন নামে একটা লোক এখানে জোর জবরদস্তি করে ঢুকে পড়েছিল। তুমি অবশ্য কাল ওর নামটা বলেছিলে। আমার মনে ছিল না। বিশাখার কাছে জানতে পারলাম লোকটা চাঁপার স্বামী।'

অদিতি উত্তর দেয় না।

অমিতাদি থামেননি, 'এরকম স্কাউন্ড্রেল আমার লাইফে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।'

অদিতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী করেছে সে ?'

প্রচণ্ড ড্রিংক করে এসেছিল লোকটা। ভকভক করে তার মুখ থেকে কান্ট্রি-লিকারের গন্ধ বেরুচ্ছিল। মাতাল অবস্থায় খিস্তি করতে করতে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করছিল। যেমন তার ফিলদি ল্যাংগুয়েজ তেমনি তার চিৎকার। আমরা একেবারে স্টানড্।'

অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'কেন এসেছিল নগেন ?'

'কেন আবার, চাঁপাকে নিয়ে যেতে। আমরা অবশ্য সবাই মিলে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি।' অমিতাদি বলতে থাকেন, 'সহজে কি যেতে চায় ? রীতিমত জোর করতে হয়েছে। তুমি চাঁপাকে নিয়ে এসেছ, তোমার সঙ্গে কথা না বলে তো মেয়েটার সম্বন্ধে কিছু করা যায় না।'

নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনে যাচ্ছিল অদিতি। ফুসফুসের আবদ্ধ বাতাস আস্তে বার করে দিয়ে সে বলে, 'নগেনকে তাড়িয়ে দিয়ে ভালই করেছেন অমিতাদি। চাঁপাকে একবার হাতে পেলে লোকটা ওকে খুন করে ফেলবে। হী ইজ ডেঞ্জারাস, আর ভেরিটেবল নুইসেন্স।'

'হ্যাঁ। দেখেশুনে মনে হল একটি অ্যান্টিসোসাল রাফায়েন।' বলে একটু ভেবে আবার শুরু করেন অমিতাদি, 'নগেন আমাদের শাসিয়ে গেছে। কী বলেছে জানো ?'

'কী ?'

'দলবল জুটিয়ে এখানে হানা দেবে। এরকম একটা জঘন্য টাইপের মাতাল বজ্জাত এখানে এসে খিস্তিখেউর করবে, হল্লা বাঁধাবে, ভাবতেই আমার বিশ্রী লাগছে। তাছাড়া আশেপাশের লোকজন কী ভাববে বল তো ?'

অদিতি বলে, 'কিন্তু—'

অমিতাদি সামনের দিকে ঝুঁকে বলেন, 'কী ?'

একটু আগে আপনি বললেন, আমার সঙ্গে কথা না বলে চাঁপার ব্যাপারে কিছু করতে পারেননি।'

অদিতি ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে অনিশ্চিতভাবে অমিতাদি বলেন, 'হ্যাঁ, বলেছি। তুমি ওকে বস্তি থেকে তুলে এনেছিলে তাই—'

'আমাদের কোনো মেম্বার যদি কোনো দুঃস্থ বিপন্ন মেয়েকে বাঁচাতে চায় সেটা কি তার একার দায়িত্ব, না আমাদের হোল অর্গানাইজেসনের ? কাল এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। তা ছাড়া—'

অমিতাদি বিব্রত বোধ করেন, উত্তর দেন না।

অদিতি বলে, 'কালই ডিসিশান নেওয়া হয়েছিল, আজ আমরা থানায় গিয়ে নগেনের নামে ডায়েরি করব। এরকম একটা ড্রাস্টিক স্টেপের কথা যখন ঠিকই করে ফেলা হয়েছে তখন চাঁপা সম্পর্কে নতুন করে ভাবার আর কিছু নেই। ওকে আমাদের প্রোটেকসান দিতেই হবে।'

অমিতাদি বলেন, 'তুমি অবশ্য কাল বলেছিলে, নগেন খুব বাজে লোক কিন্তু এতটা খারাপ চিন্তা করতে পারিনি। সে ফের এসে হাঙ্গামা করলে—' বলতে বলতে থেমে যান।

অদিতি বিষণ্ণ হাসে। অমিতাদির মনোভাব সে বুঝতে পারছিল। বলে, 'অমিতাদি, মেয়েদের সামাজিক সম্মান আর মর্যাদা রক্ষার জন্যে আমরা রাস্তায় নেমেছি। নগেন এসে গোলমাল করবে বলে, চাঁপার পরিণতি কী হবে জেনে-শুনে তাকে ওর হাতে তুলে দেবো ! কত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মেম্বার আছে 'নারী-জাগরণ'-এ। আমরা একটা বাজে লোককে শায়েস্তা করতে পারব না ?'

বিব্রতভাবে অমিতাদি বলেন, 'নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু আমার একটা কথা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখ—'

'বলুন—'

'এইসব অ্যান্টিসোসালদের পেছনে যদি সময় আর শক্তি ক্ষয় করে ফেলি, আসল কাজ কখন করব ?'

বিরক্তি এবং তিক্ততায় মন ভরে যায় অদিতির। কাল থেকে প্রায় সেই

একই কথা বলে যাচ্ছেন অমিতাদি। অর্থাৎ সোসাল ওয়ার্ক করে নাম করব কিন্তু কোনোরকম দায়িত্ব নেবো না। ভাসা-ভাসা ভাবে, শরীরে বিন্দুমাত্র আঁচ না লাগিয়ে যেটুকু করা যায় আর কি। ভেতরের ঝাঁঝ অশোভনভাবে বাইরে যাতে বেরিয়ে না আসে তেমন শিক্ষাদীক্ষা আছে অদিতির। শান্ত গলায় সে বলে, 'এটাই তো আসল কাজ অমিতাদি। এরকম জন্তুদের হাতেই বেশির ভাগ মেয়ে টরচারড হচ্ছে। এই মেয়েদের জন্যে যদি একটা আঙুলও তোলেন, নগেনের মতো বীস্টরা এখানে লাইন দিয়ে হানা দেবে। আর সেটা যদি হয়, বুঝব, সঠিক কাজটাই শুরু করতে পেরেছি।'

ডান দিকের একটা চেয়ারে বসে আছে এষা। তার বাঁ-হাতের দুই আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। মেয়েটা চেইন-স্মোকার। এষার পরনে জিনস এবং ঢোলা শার্ট। ডান হাতের কব্জিতে চওড়া স্টীল ব্যান্ডে চৌকো ঘড়ি। চুল ছেলেদের মতো করে ছাঁটা। এই পোশাক এবং সিগারেট বা চুলের ছাঁট দিয়ে অমিতাদির মডেলে পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট জানিয়ে চলেছে। সে এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার বলে ওঠে, 'নারী-জাগরণ'-এর একজ্যাক্ট কাজটা তা হলে কি এই হবে অদিতিদি ?'

'কী ?'

'আমরা অনবরত সোসাইটির টরচারড্ মেয়েদের নিয়ে এসে শেলটার দেব, আর তাদের মাতাল গুণ্ডা স্বামীরা যখন ঝামেলা করতে আসবে তাদের টিট করব ?'

অদিতি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই অমিতাদি বলে ওঠেন, 'ও-সব পরে হবে। এখন চাঁপার প্রবলেমটা কী করে সলভ্ করা যায় সেটা ভাবা যাক।'

অদিতি এষার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অমিতাদিকে লক্ষ করতে থাকে।

অমিতাদি বলে, 'চাঁপার ব্যাপারে একটা লীগ্যাল পয়েন্টও রয়েছে।'

অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'কী সেটা ?'

'তুমি থানায় ডায়েরি করার কথা বলেছ কিন্তু সেটাই এনাফ নয়।'

'কেন ?'

'নগেনও পালটা অভিযোগ করতে পারে বে-আইনিভাবে তার স্ত্রীকে আমরা আটকে রেখেছি। তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, চিন্তা করে দেখ। কোর্ট উকিল উইটনেস—সব মিলিয়ে একটা ভীষণ কমপ্লিকেটেড ব্যাপার।'

এ দিকটা ভেবে দেখেনি অদিতি। সে একটু হকচকিয়ে যায় পরক্ষণেই কী মনে পড়তে বলে ওঠে, 'চিন্তা নেই অমিতাদি, নগেন মরে গেলেও পুলিশের কাছে যাবে না।'

'মানে ?'

'প্রথমত সে হল অ্যান্টিসোসাল, তার ওপর চাঁপা তার থার্ড ওয়াইফ।

'হিন্দু কোড বিল' পাশ হবার পর ও কি গিয়ে বলবে, আমার তিন নম্বর স্ত্রীকে 'নারী-জাগরণ' গায়ের জোরে আটকে রেখেছে ?'

নগেনের এই তিন নম্বর বিয়ের ব্যাপারটা মাথায় ছিল না অমিতাদির। সত্যিই তো কোর্টে গেলে লোকটা নিজের জালেই জড়িয়ে পড়বে। একটু চিন্তা করে তিনি বলেন, 'মামলা না করলেও অন্য দিক থেকেও আমাদের অসুবিধে আছে।'

'কী ?'

'তুমি আসার আগে চাঁপার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। সে বলছিল, 'নগেনের পেছনে নাকি পলিটিক্যাল পার্টির লোকেরা রয়েছে। তারা এসে হাঙ্গামা করতে পারে।'

'আগে করুক। তারপর দেখা যাবে। এত ভয় পেলে কোনো কাজই করা যাবে না অমিতাদি। তা হলে এতকাল যা চলে আসছে—মেয়েদের ওপর অত্যাচার, বধূহত্যা, পণপ্রথা, নারীর অসম্মান—এ সবই চলুক। 'নারী-জাগরণ'-এর তা হলে আর দরকার কী ?'

রমেন বাঁদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলে, 'অদিতি ঠিকই বলেছে। গায়ে টোকা লাগবে না, অথচ রাতারাতি সোস্যাল প্যাটার্ন পাল্টে যাবে, এটা হয় না অমিতাদি।'

প্রতিষ্ঠার পর থেকে 'নারী-জাগরণ' মসৃণভাবেই কটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম চাঁপাকে নিয়ে তার সংকট দেখা দিয়েছে। মেয়েদের সত্যিকারের সমস্যার একেবারে কেন্দ্রে এসে পড়েছে সেটা। কী হবে তার আসল কাজ ? পণপ্রথা বধূহত্যা ইত্যাদি ব্যাপারে মিটিং মিছিল স্লোগান, চীফ মিনিস্টার কি গভর্নরের হাতে স্মারকলিপি দেওয়া না লাঞ্ছিত বিপন্ন মেয়েদের উদ্ধার করে এনে বাঁচাবার চেষ্টা করা ? সামাজিক প্যাটার্ন তো মুখের কথায় বদলানো যায় না।

আপাতত সাময়িকভাবে হলেও, উত্তপ্ত অস্বস্তিকর সমস্যা থেকে হৈমন্তী সবাইকে বাঁচিয়ে দেয়। ডান পাশের একটা চেয়ারে বসে ছিল সে। বলে, 'আমরা কিন্তু আবার অন্য দিকে সরে যাচ্ছি। চাঁপার ব্যাপারটা ঠিক করে নেওয়া যাক।'

হৈমন্তী 'নারী-জাগরণ'-এর একজন অত্যন্ত সক্রিয় মেম্বার। অদিতির মতোই নির্যাতিত মেয়েদের অসংখ্য সমস্যা, কলেজ আর ছাত্রছাত্রী নিয়ে তার জগৎ। এ-সবের বাইরে সে আর কিছু ভাবতে পারে না।

'নারী-জাগরণ'-এর পক্ষ থেকে একটা ত্রৈমাসিক বাই-লিংগুয়াল অর্থাৎ দ্বিভাষিক পত্রিকা বার করা হয়। দুই ভাষার একটি বাংলা, অন্যটি ইংরেজি। সমাজের নানা স্তরের মেয়েদের বিভিন্ন সমস্যা এখানে তুলে ধরা হয়। ছাপা হয় ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা মেয়েদের ইন্টারভিউ। কাগজটির নাম 'নারী'। এজন্য পশ্চিম-

বাংলা ছাড়াও দেশের বড় বড় শহরে 'নারী'র অনেক মহিলা রিপ্রেজেন্টেটিভ রয়েছে। যদিও সম্পাদক হিসেবে এতে অনিতা সরকারের নামটা থাকে, আসল কাজটা করে হৈমন্তী—হৈমন্তী আচার্য। সে একটা কলেজে ফিজিক্স পড়ায়। খানিকটা রোগা হলেও, অত্যন্ত ধারাল চেহারা, চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা।

অমিতাদি বলেন, 'প্রথমে তা হলে থানায় ডায়েরিটা করা যাক। এরপর ওকে আর নগেনের কাছে ওকে পাঠাবার প্রশ্ন ওঠে না।'

হৈমন্তী বলে, 'নিশ্চয়ই নয়। অদিতিদি ঠিক কাজই করেছে। চাঁপার জন্যে আমাদের কিছু একটা করে দিতে হবে, যাতে ও সম্মান বাঁচাতে পারে।'

অমিতাদি অন্য মেম্বারদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমাদেরও তাই মত?'

অদিতি কাল চাঁপাকে নিয়ে আসার পর অনেকেই যেমন বিরক্ত হয়েছিল তেমনি মনে মনে কেউ কেউ তার সাহস এবং কর্তব্যবোধকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেনি। তবে মুখ ফুটে কেউ কিছু বলেনি। আজ হৈমন্তীর সায় পেয়ে সবাই জানায় এটাই সঠিক কাজ। চাঁপাকে নগেনের কাছে কোনোদিনই পাঠানো হবে না। সেটা মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপার। চাঁপার যদি খারাপ কিছু হয়, আইনত না হলেও নৈতিক দিক থেকে 'নারী-জাগরণ'-এর সভ্যারা এর জন্য ষোল আনা দায়ী থাকবে।

অমিতাদি বলেন, 'আমরা না হয় চাঁপার দায়িত্ব নিলাম। একটা মানুষকে দুটো খেতে দেওয়া এমন কিছু ব্যাপার না। কিন্তু ও থাকবে কোথায়? আমাদের বেয়ারা পেছন দিকের একটা মাত্র ঘরে বউ বাচ্চা নিয়ে থাকে। চাঁপাকে সেখানে রাখা সম্ভব না। আর একটা ইয়াং গার্ল রাত্তিরে অফিসে যে থাকবে সেটাও উচিত নয়।'

হৈমন্তী বলে, 'এতে ভীষণ রিস্কও থেকে যায়। আমরা কেউ এখানে রাত্তিরে থাকি না। চাঁপার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে—মানে কত রকমের বাজে এলিমেন্ট রয়েছে, তারা একেবারে বেপরোয়া, কে যে কী করে বসবে! হয়ত দরজা-টরজা ভেঙে ঢুকেই পড়ল। তার পরের কথা আর ভাবা যায় না। খারাপ কিছু ঘটে গেলে তার সব দায় কিন্তু এসে পড়বে আমাদের ওপর।'

অমিতাদি আস্তে মাথা নাড়েন, 'তা হলে?'

অদিতি এবার বলে, 'চাঁপাকে আমাদের কারও বাড়িতে আপাতত শেলটার দিতে হবে।'

অমিতাদি বলেন, 'আমার ফ্ল্যাটটা খুবই ছোট। আমার ভাই আর আমি থাকি। তাছাড়া রয়েছে একজন কাজের লোক। সেখানে এক্সট্রা আরেক জনকে নিয়ে গেলে ভীষণ অসুবিধে হবে।'

কৃষ্ণা বলে, 'আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু পরশু কানাডা থেকে সেজদিরা এসেছে। বাড়ি একেবারে প্যাকড। দশ বছর পর এল। ওরা মাস তিন-চারেক থাকবে। আমাদের অবস্থাটা কী, বুঝতেই পারছেন—'

এরপর অন্য সবাই একে একে তাদের অসুবিধের কারণগুলি জানিয়ে দেয়।

একজন তো বলেই বসল, 'আমাদের বাড়িতে প্রচুর জায়গা। একজন কেন, দশজন বাড়তি লোকও থাকতে পারে। কিন্তু দ্যাট অ্যান্টিসোসাল গুন্ডা, সে নিশ্চয়ই গিয়ে চড়াও হবে। বাবা এসব একেবারে পছন্দ করেন না।'

এটা ঠিক, অনেকের বাড়ি বা ফ্ল্যাটে জায়গা বেশ কম। যাদের বাড়ি বড় তারা নগেনের ভয়ে চাঁপাকে আশ্রয় দিতে চাইছে না। এ জাতীয় সমাজ-বিরোধী ক্রিমিনাল টাইপের লোককে তারা এড়িয়ে চলতে চায়।

অর্থাৎ ব্যাপারটা মোটামুটি এক জায়গাতেই থেকে গেল। নীতিগতভাবে তারা চাঁপার জন্য কিছু একটা করতে বা তাকে আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেউ দায়িত্ব নেবে না, অন্যের কাঁধে চাঁপার দায় চাপুক, এটাই সবার কাম্য, তবু চাঁপাকে যে নগেনের কাছে পাঠাবার জন্য সমস্বরে সকলে জোর করেনি, সেটুকুই মন্দের ভাল।

অদিতি অন্যমনস্কর মতো সবার কথা শুনছিল। শুনতে শুনতে তার চোখের সামনে অদৃশ্য সিনেমার স্ক্রিনে তাদের বাড়িটা ফুটে উঠেছিল। সেখানে চাঁপার মতো পঞ্চাশ জনের জায়গা হয়ে যাবে। কিন্তু বাবা মা এবং দাদারা কিভাবে চাঁপার ব্যাপারটা নেবে, ভেবে উঠতে পারছিল না অদিতি। দ্বিধার ভাবটা কাটিয়ে এক সময় মনস্থির করে ফেলে। বলে, 'ঠিক আছে, সবার যখন এত অসুবিধা তখন ওকে আমাদের বাড়িই নিয়ে যাচ্ছি।' একটু থেমে বলে, 'আমি যখন চাঁপাকে বস্তি থেকে নিয়ে এসেছি তখন সব চেয়ে বেশি রেশপন-সিবিলিটি আমার।'

অদিতির কথার মধ্যে সূক্ষ্ম হলেও তীব্র একটু খোঁচা ছিল। খোঁচাটা সে ইচ্ছা করেই দিয়েছে। সবাই একসঙ্গে প্রায় গলা মিলিয়ে বলে ওঠে, 'এভাবে ব্যাপারটা নিও না। রেসপন্সিবিলিটি আমাদের সকলের। কিন্তু কিছু কিছু অসুবিধে তো প্রত্যেকেরই থাকে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড।'

যা বোঝার অদিতি আগেই বুঝে নিয়েছে। চাঁপার সমস্যাটা দুম করে হাজির না হলে 'নারী-জাগরণ'-এর মেম্বারদের এত স্পষ্ট করে জানা যেত না। অদিতি কারো কথায় উত্তর দেয় না।

অমিতাদি খানিক চিন্তা করে বলেন, 'হঠাৎ একটা কথা আমার মাথায় এল অদিতি।'

অদিতি জানতে চায়, 'কী ?'

অমিতাদি বলেন, 'চাঁপাকে মেয়েদের কোনো হোমে আপাতত রেখে দিলে কেমন হয় ?'

অদিতি দৃঢ় গলায় বলে, 'না।'

'না মানে ?'

'আমি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাই না। ওকে আজই আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। তারপর দেখা যাক, কী করা যায়—'

অমিতাদি অস্বস্তি বোধ করেন। বলেন, 'চাঁপার ব্যাপারটা তোমাদের বাড়ির লোকেরা জানেন ?'

অদিতি বলে, 'এখনও জানে না। নিয়ে যাবার পর জানতে পারবে।'

'হঠাৎ এভাবে নিয়ে গেলে—' বলতে বলতে থেমে যান অমিতাদি।

তিনি কী ইঙ্গিত দিয়েছেন, বুঝতে অসুবিধে হয় না অদিতির। সে বলে, 'এ ব্যাপারে চিন্তা করবেন না অমিতাদি। কিছু প্রবলেম নিশ্চয়ই দেখা দেবে। কিন্তু সেটা তো ফেস করতেই হবে।' বলে একটু হাসে। তারপর চাঁপার দিকে চোখ ফেরায়, 'চল আমার সঙ্গে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়।

সমস্ত ঘরের আবহাওয়া হঠাৎ অত্যন্ত অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে।

এদিকে চাঁপা হাঁটুর ফাঁক থেকে মুখ তুলে উঠে পড়েছিল। অমিতাদি বলেন, 'এখনই যাবে ?'

অদিতি মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয়, 'হ্যাঁ।'

'আজ তো বস্তিতে যাওয়া হল না।'

'না, কাল থেকে যাব।'

অমিতাদি বলেন, 'তুমি আসার আগে একটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম।'

অদিতি কোনো প্রশ্ন না করে অমিতাদির দিকে তাকায়।

অমিতাদি থামেননি, 'তুমি বরং কিছুদিন বস্তিতে যেও না। পরশু থেকে আমরা যে সেমিনার করছি সেখানে মডারেটর হিসেবে থেকো।'

অমিতাদির মনোভাব খুবই স্পষ্ট। বস্তিতে গেলে নগেন গণ্ডগোল করতে পারে, সেই কারণে তিনি অদিতিকে সেখানে যেতে দিতে চান না।

পরশু দিনের সেমিনারটার কথা অদিতি জানে। দিল্লী বম্বে বাঙ্গালোর হায়দরাবাদ থেকে নাম-করা সোসিওলজিস্ট, ঐতিহাসিক, ইকোনমিস্ট, রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা এতে বক্তা হিসেবে যোগ দেবেন। তাছাড়া কলকাতার কয়েকজন সাংবাদিক এবং ঐতিহাসিককেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ জন্য তিনমাস আগেই একটা এয়ার-কন্ডিশানড হল বুক করা হয়েছে। অবশ্য 'নারী-জাগরণ'-এর এতে একটি পয়সাও খরচ নেই। একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানি সেমিনারটা স্পনসর করছে। বড় বড় কাগজে

বিজ্ঞাপন দেওয়া থেকে শুরু করে ভাল হোটেলে বক্তাদের রাখার ব্যবস্থা, তাঁদের প্লেন ভাড়া ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব ওই কোম্পানীর। সেমিনারের বিষয় হল, ধর্ষিতা এবং পরিত্যক্ত মেয়েদের সামাজিক পুনর্বাসনের সমস্যা। এজন্য সমস্ত দেশে 'নারী-জাগরণ'-এর মতো যত সংস্থা আছে সবগুলোকে নিয়ে একটা সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলা। তার মূল কেন্দ্র হল দিল্লী। এই সংগঠনের প্রধান কাজ হবে সেন্ট্রাল এবং যাবতীয় স্টেট গভর্নমেন্ট আর বড় বড় বিজনেস আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসগুলোর কাছ থেকে গ্রান্টস ডোনেশান ইত্যাদি জোগাড় করে দিল্লী আর সব স্টেট ক্যাপিটালে লাঞ্ছিতা মেয়েদের জন্য আশ্রয়-কেন্দ্র এবং যাতে কোনো হাতের কাজের ট্রেনিং নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া। ক্রমে কর্মসূচি শুধু স্টেট ক্যাপিটালের মতো বড় বড় শহরেই না, ছোট মফস্বল শহর এবং গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সবার আগে যা দরকার তা হল, মেয়েদের ব্যাপারে যারা কাজ করছে তাদের একসঙ্গে জড়ো করে একটা শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা। পরশু এখানে যে সেমিনার হচ্ছে তেমন সেমিনার ভারতবর্ষের সব বড় শহরেই করা হবে। কলকাতারটা দিয়েই তার শুরু।

অদিতির এ জাতীয় সেমিনার খুব একটা পছন্দ নয়। আরামদায়ক হল-এ বসে ভাল ভাল কথা বলে, দামী লাঞ্চ বা ডিনার খেয়ে কাজের কাজ কী বা কতটা হয় সে জানে না। গ্রাসরুটে গিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজটা করতে চায় সে।

অদিতি বলে, আপনি কী ভাবছেন বুঝতে পারছি অমিতাদি। কিন্তু একটা অ্যান্টিসোসাল হুলিগানের ভয়ে যদি বস্তিতে যাওয়া বন্ধ করে দিই তার চেয়ে লজ্জার কিছু নেই। আজ আর হল না, কাল থেকে আবার বস্তিতে যাব। আপনি অন্য কারও ওপর সেমিনারের দায়িত্ব দিন। বিকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার যদি এখানে খুব জরুরি কাজ না থাকে, আমাদের সঙ্গে আসবে?'

বিকাশ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, 'না, তেমন কোনো কাজ নেই। চল—'

রাস্তায় বেরিয়ে বিকাশ আর অদিতি পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। তাদের পেছনে চাঁপা।

অদিতি আগে কোনোদিন তাকে এভাবে ডেকে নিয়ে আসেনি। বিকাশ বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বলে, 'আমাকে কিছু বলবে?'

অন্যমনস্কর মতো মাথাটা সামান্য কাত করে অদিতি, 'হ্যাঁ।'

'বল—' বিকাশ উদ্গ্রীব তাকায়।

'কাল বলছিলে, তোমার ফ্ল্যাটটার পজেশান শীগ্‌গিরই পেয়ে যাবে—'
'হ্যাঁ !'
'এক উইকের মধ্যে পাওয়া কি সম্ভব ?'
'চেষ্টা করতে পারি। কেন বল তো ?'
অদিতি বলে, 'মনে হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি আমাকে একটা ডিসিশান নিতে হতে পারে।'

শোনার পরও ব্যাপারটা বিকাশের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে সে। তারপরই টের পায় বুকের ভেতর হাজারটা ঘোড়া যেন ছুটে যাচ্ছে। মনে হয়, প্রচণ্ড রক্তচাপে তার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবে। প্রবল আগ্রহে তার চোখমুখ ঝকমক করতে থাকে। সে বলে, 'সত্যি !'

অদিতির কিন্তু তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। শান্ত নিস্পৃহ মুখে সে বলে, 'হ্যাঁ।'

অদিতির এই একটি কথা শোনার জন্য কতদিন উন্মুখ হয়ে আছে বিকাশ। এমন কি কালও রাত্তিরে যখন অদিতিকে তাদের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে যায় তখনও সে মনস্থির করে উঠতে পারেনি। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর হঠাৎ কী এমন ঘটে গেল যাতে তাকে এরকম স্পষ্ট একটি সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে ? যাই ঘটুক তা নিয়ে বিকাশের বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। অদিতি শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছে তাতেই সে খুশি। এটাই তার জীবনের একটা বিশাল প্রাপ্তি। কতদিন ধরে এই মুহূর্তটার জনাই সে অপেক্ষা করে আছে ! আসলে বিকাশ যে 'নারী জাগরণ'-এর মেম্বার হয়েছিল তার একমাত্র কারণ অদিতি। মেয়েরা যে অনবরত লাঞ্ছিত হচ্ছে বা তাদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটে যাচ্ছে, এ সব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না সে। নারীর মর্যাদা রক্ষার নৈতিক এবং সামাজিক দায় যে প্রতিটি শিক্ষিত সচেতন মানুষের থাকা উচিত, এমন কোনো বোধ তার মধ্যে খুব একটা নেই। অদিতি জানে না, এই যুবকটি মানুষ হিসেবে তেমন খারাপ না। এ দেশে একটি পুরুষ তারুণ্যে পৌঁছুলে যেমনটা হয় বিকাশ তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আত্মকেন্দ্রিক, অন্যের ক্ষতি না করে যতখানি স্বার্থপর হওয়া যায় সে তা-ই। বিরাট কোনো অ্যাম্বিসান তার নেই। বড় কিছু ভাবতেও পারে না। গড়পড়তা মাঝারি মাপের মানুষ বিকাশ। চাকরিতে মোটামুটি দু-তিনটে প্রোমোশান, একটা মাঝারি ফ্ল্যাট কি ছোট একখানা বাড়ি, গাড়ি হলে তো স্বর্গই হাতে পাওয়া, এর মধ্যেই তার যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ। বিরাট উচ্চাশা বলতে তার যা আছে তা হল অদিতিকে পাওয়া। ফ্ল্যাট আর প্রোমোশানের সঙ্গে অদিতিকে পেলে জীবনে সুখের বৃত্তটি তার সম্পূর্ণ হয়।

অদিতির জন্য যে ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিয়ে এসেছে, এতকাল

বাদে তার দাম পেতে চলেছে বিকাশ। সে বলে, 'তা হলে তো—'

'কী?' নিরুৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করে অদিতি।

'ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে নোটিশ দিতে হয়।'

'এত তাড়াহুড়োর কী আছে?'

'আছে।' গাঢ় আবেগের গলায় বিকাশ বলে, 'শুভকাজ ফেলে রাখতে নেই। ভাবো তো কতদিন তোমার ডিসিশানের জন্যে অপেক্ষা করে আছি।'

বিকাশের মনোভাব বুঝতে পারছিল অদিতি। সে নরম গলায় বলে, 'এখন নয়। এ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।'

'ঠিক আছে।' বিকাশ বলতে থাকে, 'হাউসিং বোর্ডে আমার কিছু জানাশোনা অফিসার আছে। কালই তাহলে ফ্ল্যাটটার ব্যাপারে তাদের ধরা যাক, না কী বল—'

অদিতি উত্তর দেয় না। কেননা যা বলার আগেই বলে দিয়েছে। এক কথা বার বার বলা সে পছন্দ করে না।

হঠাৎ কিছু মনে পড়তে গলা অনেকটা নামিয়ে বিকাশ বলে, 'চাঁপাকে তো নিয়ে এলে। তার কী হবে?'

হাঁটতে হাঁটতে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে বিকাশের দিকে তাকায় অদিতি। আস্তে করে বলে, 'কিছু একটা নিশ্চয়ই হবে।'

চাঁপার ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করে না বিকাশ।

একসময় ওরা বড় রাস্তায় চলে এল এবং কালকের মতো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা পর অদিতির বাড়ির কাছে চাঁপা এবং অদিতিকে নামিয়ে দিয়ে বিকাশ ভবানীপুর চলে যায়।

সাত

সামনের ঝোপঝাড় পেরিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতেই একতলার বসার ঘরে সিতাংশু ভৌমিকের চড়া গলায় শাসানি কানে আসে।

'আপনাদের একমাস সময় দিচ্ছি। এর ভেতর আমার টাকাটা শোধ করে দেবেন। না হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

শুনতে শুনতে অদিতির হাসি পায়। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লোকটা আমূল বদলে গেছে এবং তার আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে।

এবার দুই দাদা এবং বাবার ভীরু মিনমিনে কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

'আপনি শান্ত হন। দয়া করে একটু ধৈর্য ধরুন। আমরা বুবুকে আরেক বার বোঝাব।'

অদিতির রাগ হয় না, বরং মজাই লাগে। বাবা এবং দাদারা এখনও

আশা করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে দিয়ে সিতাংশুর গলায় বরমালা পরাতে পারবে।

মজার সঙ্গে খানিকটা দুঃখও বোধ করে অদিতি। অর্থবান এবং মর্যাদা-সম্পন্ন শিবপ্রসাদ ব্যানার্জির বংশধরেরা একটা চতুর্থ শ্রেণীর লম্পটের কাছে সাড়ে চার লাখ টাকার জন্য প্রায় করুণা ভিক্ষা করছে। কোনোরকমে বাড়ির মেয়েকে তার হাতে তুলে দিয়ে তারা বাঁচতে চায়। কুড়ি বছর আগে এ বাড়িতে এমন ব্যাপার ভাবা যেত!

ওদিকে কিন্তু ফাঁপা রঙিন প্রতিশ্রুতিতে কাজ হয় না। সিতাংশু ঝানু ব্যবসাদার। লেনদেনের হিসেবটা তার কাছে পরিষ্কার। সে বলে, 'অদিতি যেভাবে কাল আমাকে অপমান করেছে, তারপর আর বোঝাবার দরকার নেই। আমার কথাটা মনে রাখবেন, এক মাসের মধ্যে টাকা ফেরত চাই।'

প্যাসেজে অন্য দিনের মতো আজও টিমটিমে বাল্বটা ওপর থেকে ঝুলছিল। সেটার তলা দিয়ে চাঁপাকে নিয়ে যেতে যেতে অদিতির চোখে পড়ে, বাঁ পাশের ড্রইংরুমে সিতাংশু, বাবা এবং দুই দাদা কালকের মতোই মুখোমুখি বসে আছে।

ওরা চারজনই অদিতি আর চাঁপাকে দেখতে পেয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্য সবাই চুপ করে যায় এবং তার মধ্যেই অদিতিরা সিঁড়ির কাছে চলে আসে। সেখানে কালকের মতোই দুর্গা দাঁড়িয়ে আছে। সে নিশ্চয়ই বাইরের ঘরের কথাবার্তা শুনছিল।

দুর্গা তার এবং মৃণালিনীর গুপ্তচর। ভাল ট্রেনিং পেলে আরেকটি মাতাহারি হয়ে উঠতে পারত। অদিতি জানে, সে যদি এখন না-ও ফিরত সিতাংশুর আসার খবর আর বাবা দাদাদের সঙ্গে তার আলোচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ মস্তিষ্কে নোট করে রাখত দুর্গা এবং শুতে যাবার আগে এসব জেনে যত অদিতি।

দুর্গা বলে, 'সেই লোকটা আবার এসেছে ছোটদি।'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলে, 'দেখলাম তো।'

'তুই কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছিস?'

'তা আধঘণ্টা হবে।'

বোঝা যায়, ঠিক আধ ঘণ্টা আগেই এ বাড়িতে ঢুকেছে সিতাংশু এবং সে এখান থেকে না যাওয়া পর্যন্ত দুর্গাকে নড়ানো যাবে না।

দুর্গা বলে, 'পিসিমা আমাকে বলে দিয়েচেন, ওই লোকটা এলেই যেন এখানে এসে দাঁড়াই।'

কারণটা জানাই আছে অদিতির। তবু রগড় করার জন্যই জিজ্ঞেস করে, 'কেন রে?'

দুর্গা চোখ বড় বড় করে নিচু গলায় বলে, 'বা রে, তুমি যা ভালমানুষ,

বড়বাবু আর দাদাবাবুরা যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে ওই হারামজাদার সঙ্গে বিয়েতে তোমায় রাজী করিয়ে ফেলে।'

দুর্গা নিজের থেকেই তার ব্যাপারে বিরাট এক দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে। ওর ধারণা সে বড়ই সরল এবং সাদাসিধে, রমাপ্রসাদ এবং বরুণ আর মৃগাঙ্ক কৌশলে তাকে ফাঁদে ফেলে দেবে। কাজেই তাকে আগলে আগলে রাখা দরকার। ভেতরে ভেতরে কৌতুক বোধ করলেও গম্ভীর মুখে অদিতি বলে, 'হুঁ, সে ভয়টা আছে। লোকটা এলেই তুই এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিবি, নইলে ভুল করে কী যে করে ফেলব!'

দুর্গা কিছু একটা আঁচ করে নিয়ে স্থির চোখে অদিতিকে লক্ষ করে। বলে, 'ও, তুমি ঠাট্টা করছ!'

অদিতি হাসে. কিছু বলে না।

দুর্গা কথা বলতে বলতে বার বার চাঁপার দিকে তাকাচ্ছিল। এবার সে জিজ্ঞাসা করে, 'এ কে গো ছোটদি?'

'পরে শুনিস।'

দোতলায় উঠতেই চোখে পড়ে, বাঁ দিকের ঢালা বারান্দায় বসে হেমলতা একটা জামায় বোতাম লাগাচ্ছেন। প্রায় রোজই বিকেলের পর মাকে এখানে বসে থাকতে দেখা যায়। হয় সেলাই ফোঁড়াই কিছু করেন, নইলে বই পড়েন বা চাল বাছেন।

ছোট বৌদি মীরা একধারে বসে হেমলতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আগামী শীতের কথা মাথায় রেখে একটা কার্ডিগান বুনছে।

একটু দ্বিধান্বিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে অদিতি। প্রথমে সে ভেবেছিল, চাঁপাকে নিয়ে সোজা তেতলায় নিজের ঘরে চলে যাবে এবং পরে এসে তার কথা সবাইকে জানাবে। কিন্তু এখন ঠিক করে ফেলে, আগেই চাঁপাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে তার এ বাড়িতে থাকার কথা বলবে। তারপর ওপরে নিয়ে যাবে।

অদিতি চাঁপাকে বলে, 'এসো আমার সঙ্গে—'

দুজনে বারান্দায় এলে হেমলতা এবং মীরা চোখ তুলে তাকায়। মীরার মুখ মুহূর্তে থমথমে হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ এক হেঁচকায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেয় সে এবং দুমদাম পা ফেলে নিজের ঘরে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে। কাল রাতের সেই উত্তেজক ঘটনার পর মীরা তার সঙ্গে কথা বলছে না। অদিতি জানে, শুধু কথা বন্ধই না, সবরকমভাবে এখন থেকে সে তার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। যতক্ষণ না প্রতিশোধ নিতে পারছে, নানা ফন্দি এঁটে যাবে।

হেমলতা চাঁপাকে অদিতির সঙ্গে একটি অচেনা বিবাহিত মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ছুঁচ সুতো আর জামা নিচে নামিয়ে রেখে আস্তে

আস্তে বলেন, 'মেয়েটি কে রে ?'

অদিতি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। মুখ ফেরাতেই অদিতির চোখে পড়ে, এক সঙ্গে দুটো তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে রুদ্ধশ্বাসে তেতলায় চলে গেল দুর্গা। একটু পরে বরুণ মৃগাঙ্ক এবং রমাপ্রসাদ উঠে এসে সোজা দোতলায় চলে আসেন।

রমাপ্রসাদ বেশ নরম গলায় বলেন, 'খানিকক্ষণ আগে তোকে আসতে দেখলাম। আজ তোর মুড কেমন আছে রে বুবু ?'

রমাপ্রসাদ যে অতীব সুচতুর, কূটনীতি এবং মনস্তত্ত্ব যে তাঁর আয়ত্তে, তা বোঝা যাচ্ছে। এসব কীসের ভূমিকা, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে অদিতি। বাবা বা দাদারা খুব সম্ভব স্ট্র্যাটেজিটা বদলে ফেলেছে। সে ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে যায়। পাল্টা চাল দিয়ে বলে, 'এখনও পর্যন্ত ভালই আছে। এরপর যদি তোমরা খারাপ করে দাও, আলাদা কথা—'

'কী আশ্চর্য, আমাদের তোর শত্রু ভাবছিস কেন ?' রমাপ্রসাদ বলেন, 'মা-বাবার চেয়ে ওয়েল-উইশার আর হয় ?'

উত্তর না দিয়ে অদিতি অপেক্ষা করতে থাকে।

'তোর সঙ্গে একটা কাজের কথা ছিল—' বলতে বলতে হঠাৎ চাঁপার দিকে নজর চলে যায় রমাপ্রসাদের। কপালটা সামান্য কুঁচকে যায় তাঁর। পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাঁপাকে দেখতে দেখতে বলেন, 'মেয়েটিকে তো চিনলাম না।'

অদিতি বলে, 'এর নাম চাঁপা।'

'তা এখানে—'

'আমি ওকে নিয়ে এসেছি।'

কিছুই বুঝতে পারছিলেন না রমাপ্রসাদ। রীতিমত অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেন, 'হঠাৎ ?'

অদিতি বলে, 'তোমরা বসো। ওর কথা তোমাদের শোনা দরকার।'

রমাপ্রসাদ বলেন, 'মেয়েটের কথা পরে শোনা যাবে। ও অন্য কোথাও একটু বসুক। তোর সঙ্গে আমাদের আলোচনাটা আগে সেরে নিই।'

অদিতি প্রায় জেদই ধরে, 'না, চাঁপার ব্যাপারটা ভীষণ জরুরি। এটা ওর লাইফ অ্যান্ড ডেথের প্রশ্ন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রমাপ্রসাদ বলেন, 'ঠিক আছে, তুই যখন না শুনিয়ে ছাড়বি না তখন বল—'

বারান্দার এধারে ওধারে কয়েকটা বেতের মোড়া এবং চেয়ার-টেয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সেগুলো টেনে এনে রমাপ্রসাদরা বসে পড়েন। অদিতিও বসে। কিন্তু চাঁপাকে বসতে বললেও সে একধারে দেয়ালের গায়ে সেঁটে একেবারে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কাল 'নারী-জাগরণ'-এর তরফ থেকে বস্তিতে সমীক্ষা চালাতে যাবার পর থেকে এখন পর্যন্ত চাঁপাকে নিয়ে যা যা ঘটেছে, সমস্ত জানিয়ে অদিতি বলে, 'ওকে বাড়িতে না নিয়ে এসে আমার উপায় ছিল না বাবা। তোমরাই ভেবে দেখ, মেয়েটাকে আমরা জানোয়ারের হাতে তুলে দিতে পারি না।'

ষাট-সত্তর বছরের এই পুরনো বাড়িটা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপরেই বিস্ফোরণ ঘটে যায়। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মৃগাঙ্ক বলে, 'এটা কি ধর্মশালা যে যাকে তাকে শেলটার দিতে হবে?'

বরুণও তীব্র গলায় বলে, 'সব ব্যাপারের একটা সীমা আছে। বস্তি থেকে একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে এল। এর দায়িত্ব কে নেবে?'

রমাপ্রসাদ অবশ্য কিছু বলেন না! মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায়, তাঁর আর্থরাইটিসের যন্ত্রণাটা ফের চাড়া দিয়ে উঠেছে।

চাঁপার কথা বললে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, অদিতির সে সম্পর্কে ধারণা ছিল। সে আদৌ উত্তেজিত হয় না। অত্যন্ত শান্ত মুখে বলে, 'তোমাদের কাউকেই ওর দায়িত্ব নিতে হবে না।'

বরুণ কঠোর গলায় বলে, 'ও থাকবে কোন ঘরে?'

'আমাদের বাড়িতে ঘরের অভাব আছে?' বলে একদৃষ্টে দাদার দিকে তাকায় অদিতি। সে থামেনি, 'অন্য ঘরে আপত্তি হলে আমার ঘরটা তো রয়েছে, চাঁপা সেখানেই থাকবে। সেখান থেকে ও বেরুবে না। বাইরে যাবার দরকার হলে আমিই ওকে নিয়ে যাব। তোমাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি ও কোনোভাবেই কাউকে ডিসটার্ব করবে না।'

বরুণ বলে, 'তুমি রোজগার কর, ওকে খেতে দিতে পারবে। সবই জানি, তবু ওর এ বাড়িতে থাকা চলবে না।'

অদিতি বলে, 'বললাম তো চাঁপার জন্যে কারো অসুবিধা হবে না।'

বরুণ বলে, 'অসুবিধা হোক, না হোক, কাউকে ও ডিসটার্ব করুক বা না করুক, এখানে ওর থাকা চলবে না। এটা আমার সাফ কথা।'

মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে অদিতির, 'কেন? কিছুদিন আগে দিল্লী থেকে তোমার এক পাঞ্জাবী বন্ধু ফ্যামিলি নিয়ে এসে যখন দেড়মাস থেকে গেল তখন আমি কিন্তু আপত্তি করিনি।'

'কাদের সঙ্গে কার তুলনা করছিস! তারা বিশিষ্ট ভদ্রলোক—'

'চাঁপাকে তুমি অভদ্র ধরে নিলে কী কারণে? বস্তিতে থাকে বলে?'

বরুণ বলে, 'একজাক্টলি। এদের নানারকম ঝামেলা থাকে। তা ছাড়া ওই টাইপের হুলিগান যার হাজব্যান্ড তাকে নিয়ে অনেক প্রবলেম। পরে ঝঞ্ঝাট হলে কে সে-সব সামলাবে?'

অদিতি বলে, 'এ নিয়ে কাউকে ভাবতে হবে না। ওর সব সমস্যা আমার।'

মৃগাঙ্ক ওধার থেকে বলে, 'যেই দায়িত্ব নিক, এ-বাড়িতে ওই রকম একটা মেয়েকে থাকতে দিতে আমারও আপত্তি আছে। আই ডোণ্ট লাইক ইট।'

অদিতি এবার রমাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাবা, তোমার কি মত?'

রমাপ্রসাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তিনি মেয়ে না দুই ছেলের, ঠিক কোন দিকে যাবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত অশান্তির ভয়েই খুব সম্ভব কাতর গলায় বলেন, 'ওরা যখন চাইছে না তখন—'

বাবাকে দেখতে দেখতে স্তম্ভিত হয়ে যায় অদিতি। সে এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, একটা বড় কলেজের নাম-করা অধ্যাপিকা, তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা রয়েছে। সাংসারিক খরচের অনেকটাই সে দিয়ে থাকে। অথচ বাবার কাছে অদিতির সামাজিক দায়িত্ববোধের চেয়ে দুই জুয়াড়ী ছেলের মতামতের দাম অনেক বেশি। তার মন বিষাদে ভরে যায়। সে বলে, 'তার মানে তোমারও আপত্তি আছে। কিন্তু তোমরা যাই ভাবো, যতদিন কিছু ব্যবস্থা না হয় চাঁপা এখানেই থাকবে।'

বরুণের রক্তচাপ হঠাৎ যেন বেড়ে যায়। সে বলে, 'এটা মগের মুল্লুক নাকি? যার যা ইচ্ছে তাই করবে!'

অদিতি তীক্ষ্ন গলায় বলে, 'আমারও তো এই প্রশ্নটাই অনেক আগে হতে পারত। আমি একটা অসহায় মেয়েকে আশ্রয় দিতে চাইছি মাত্র। তোমরা এ বাড়িতে কাদের নিয়ে আসছ, তারা কী ধরনের মানুষ ভেবে দেখেছ? আমাকে জিজ্ঞেস করে তাদের ঢোকানো হয়?'

ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট। সিতাংশু বা ওই জাতের লোকেদের কথাই বলেছে অদিতি। মারমুখী হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল বরুণ আর মৃগাঙ্ক। হাত তুলে তাদের থামিয়ে দেয় রমাপ্রসাদ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর অদিতি এভাবে শুরু করে, 'বাবা, আমার সঙ্গে তোমাদের কী জরুরি কথা যেন ছিল—'

সুর কেটে গিয়েছিল। রমাপ্রসাদ ক্লান্ত গলায় বলেন, 'আজ থাক, কাল শুনিস—'

'আমি তাহলে এখন ওপরে যাই।'

রমাপ্রসাদ উত্তর দেন না।

অদিতি আর বসে না, সকলের সব বাধা অগ্রাহ্য করে চাঁপাকে নিয়ে তেতলায় চলে যায়।

আট

পরদিন সকালে সবে রোদ উঠেছে, একটানা বোমার আওয়াজে অদিতিদের নিরিবিলি অভিজাত পাড়াটা হকচকিয়ে যায়। এই অঞ্চলটা কলকাতার ভেতরে থেকেও যেন কলকাতার বাইরে—একটা প্রায় নির্জন দ্বীপ বা লেগুনের মতো। এখানকার চিরস্থায়ী শান্তি চুরমার করে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি।

খুব ভোরে ওঠা অদিতির বহুকালের অভ্যাস। সে যখন ওঠে, এ-বাড়ির কারোর ঘুম ভাঙে না। তেতলায় তার নিজের ঘরটিতে হীটার এবং চা তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম রয়েছে। মুখটুখ ধুয়ে এসে এক কাপ চা করে নেয় সে, তারপর টেবলের সামনে গিয়ে বসে। এই সময়টা হয় পড়াশুনো বা লেখালিখি কিছু করে, নইলে ছাত্রছাত্রীদের খাতা দেখে।

আজ দু-কাপ চা করে নিয়েছিল অদিতি। এক কাপ নিজের জন্য, দ্বিতীয় কাপটা চাঁপার।

চা খেতে খেতে অদিতি ক্লাস টেস্টের খাতা দেখছে, আর চাঁপা রাস্তার দিকের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়ির সামনে এবং পেছনে ঝুপসি গাছপালার মাথায় তুমুল হইচই বাধিয়ে অগুনতি পাখি উড়ছে। দূরের রাস্তা দিয়ে ক্বচিৎ ক্যালকাটা মিল্ক সাপ্লাইয়ের দু-একটা ভ্যান কিংবা রিকশা চলেছে। আর দেখা যাচ্ছে খবরের কাগজওয়ালাদের। ঊর্ধ্বশ্বাসে সাইকেল ছুটিয়ে তারা এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঢুকে পড়ছে। কাগজ ফেলে দিয়ে আবার দৌড়।

অদিতিদের বাড়ির উল্টোদিকের ফুটপাথে একটা ফুটিফাটা তেরপলের ছাউনির তলায় ছোট চায়ের দোকান। হিন্দুস্থানী দোকানদার সেখানে সবে কয়লার উনুন ধরিয়েছে। গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে। কয়েকটি রিকশাওলা ঠেলাওলা এবং সামান্য মজুরজাতীয় লোক কাছাকাছি বসে আছে—কখন চা হবে সেই আশায়।

এমন এক উত্তেজনাশূন্য শান্ত সকালে এইরকম একটি পাড়ায় বোমা ফাটানোর মতো মারাত্মক ব্যাপার ঘটতে পারে, এখানকার বাসিন্দাদের কাছে তা অভাবনীয়। বোমার আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে উত্তেজিত চিৎকারও ভেসে আসছে।

খাতা দেখতে দেখতে চমকে ওঠে অদিতি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাঁপার ভয়ার্ত গলা শোনা যায়, 'দিদি—'

দ্রুত ঘুরে বসতেই অদিতি দেখতে পায়, চাঁপা প্রায় কাঁপছে। সে এতই সন্ত্রস্ত যে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে?'

জানালার দিকে আঙুল বাড়িয়ে শিথিল গলায় চাঁপা বলে, 'ওরা—ওরা এসেছে।'

বোমা ফাটিয়ে হল্লা করতে করতে কারা এভাবে হানা দিতে পারে, মুহূর্তে আন্দাজ করে নেয় অদিতি। চেয়ার থেকে উঠে এক দৌড়ে রাস্তার দিকের জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে। যা ভেবেছিল তা-ই। তাদের বাড়ির গেটটার ঠিক বাইরে প্রচণ্ড উত্তেজিত ভঙ্গিতে আট দশটা চোয়াড়ে হুলিগান ধরনের লোক সমানে চেঁচাচ্ছে আর মাঝে মাঝে দু-একটা বোমা ফাটাচ্ছে। ওদের ভেতর নগেনকে দেখতে পাওয়া যায়।

একসঙ্গে চিৎকার করে তারা কী বলছে, কিছুই প্রায় বোঝা যায় না। তবে অকথ্য খিস্তিখেউড় যে দিচ্ছে, তাদের কুৎসিত, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি থেকেই সেটা টের পাওয়া যায়।

নগেনরা যে এতদূরে এসে সকালবেলা চড়াও হবে, ভাবতে পারেনি অদিতি। বাড়িতে এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তার একটা পরিষ্কার ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে অদিতির। প্রথমটা ভীষণ ভয় পেয়ে যায় সে। পরক্ষণেই অসহ্য রাগে তার মাথায় বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। একটা অ্যান্টি-সোসাল ক্রিমিনালের এত বড় সাহস যে, তাদের বাড়ির সামনে এসে বোমা ফাটিয়ে খিস্তি করছে!

প্রথমটা কী করবে ভেবে পায় না অদিতি। অমিতাদিকে ফোন করবে কি? তিনি যদি 'নারী-জাগরণ'-এর মেম্বারদের নিয়ে চলে আসেন। পরক্ষণে কালকের অভিজ্ঞতাটা মনে পড়ে যায়। চাঁপার ব্যাপারে সবাই গা বাঁচিয়ে চলতে চায়। সে মনস্থির করে ফেলে. না, কাউকে আপাতত ডাকবে না।

মস্তিষ্কের ভেতর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দ্রুত কিছু চিন্তা কাজ করে যাচ্ছিল। অদিতির চোখের সামনে হঠাৎ সৈকতের মুখ ভেসে ওঠে। আশ্চর্য, কাল এতসব কাণ্ড ঘটে গেল, অথচ কেন যে ওর কথা একবারও মনে এল না!

প্রেসিডেন্সি কলেজে তাদের ব্যাচ-মেট সৈকত আই. পি. এস হয়ে এখন লালবাজারে পোস্টেড। ওর কথা ভাবতেই মনে অনেকখানি জোর পায় অদিতি। সে ঠিক করে ফেলে এখনই তাকে ফোন করে পুলিশ পাঠাতে বলবে।

আগে এ বাড়িতে ফোন ছিল। বিল দিতে না পারায় অনেক দিন আগেই ক্যালকাটা টেলিফোনের লোকেরা লাইন কেটে দিয়ে গেছে। পাশের বাড়িতে অবশ্য ফোন আছে। তেমন জরুরি ব্যাপার হলে এখানে চলে যায় অদিতি। ওরা খুবই ভদ্র, আপত্তি করে না।

যেভাবে নগেনরা হামলা করছে তাতে বাড়ির সামনে দিয়ে এখন যাওয়া ঠিক হবে না। পেছন দিয়ে সরু একটা প্যাসেজ রয়েছে, সেদিক দিয়েই যাবে অদিতি।

রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে চাঁপা বলে, 'কী হবে দিদি ?'

অদিতির মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, 'কী আবার হবে। ভয়ের কিছু নেই।'

আশ্বাস সত্ত্বেও আতঙ্ক কাটে না চাঁপার। যে লোক দলবল জুটিয়ে এই বাড়ি পর্যন্ত এসে হানা দিতে পারে তাকে ভয় না পেয়ে উপায় কী? সে বলে, কিন্তু—'

চাঁপার কাঁধে একটা হাত রেখে ভরসা দেবার ভঙ্গিতে অদিতি বলে, 'আমি তো আছি। একটা ফোন করে আসি। তুমি এ ঘর থেকে একেবারে বেরুবে না।' একটু ভেবে বলে, 'ঠিক আছে, তোমাকে পিসির কাছে দিয়ে যাই।' কাল রাত্তিরেই তেতলায় এসে মৃণালিনীর সঙ্গে চাঁপার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল অদিতি।

চাঁপা যেন তার কথা শুনতে পাচ্ছিল না। অপরাধীর মতো মুখ করে সে বলে, 'আমার জন্যে আপনি কী বিপদে পড়লেন বলুন তো। একটা কথা বলব ?'

'কী ?'

'আমি বরঞ্চ ওর সন্‌গে চলেই যাই। আমার কপালে যা আচে তা-ই হোক।' চাঁপার মুখ দেখে মনে হয়, তার ভেতরকার সব শক্তি এবং সাহস একেবারে ফুরিয়ে যাচ্ছে।

'না।' প্রায় ধমকের গলায় বলে ওঠে অদিতি, 'এসো আমার সঙ্গে ! আমি দেখব নগেন কত বড় বদমাশ। সহজে ওকে ছাড়ব না। চল—'

কিন্তু যাওয়া আর হয় না। তার আগেই চোখে পড়ে, মৃগাঙ্ক এবং বরুণ বাড়ির ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে গেটের দিকে যাচ্ছে। দুজনেই, বিশেষ করে মৃগাঙ্ক দারুণ গোঁয়ার। কলেজে ইউনিভারসিটিতে পড়ার সময় প্রচুর মারদাঙ্গা করেছে। পুলিশে ওর নামে রিপোর্ট'ও হয়েছিল বারকয়েক।

দুই দাদার পর রমাপ্রসাদকেও গেটের দিকে যেতে দেখা যায়। বাবার এমনিতেই শরীর ভাল না, কোমরে বহুদিনের আর্থরাইটিস, হার্টের অবস্থাও বেশ খারাপ। বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। তার আগেই লালবাজারে সৈকতকে ফোনটা করা দরকার।

অদিতি চাঁপার একটা হাত ধরে মৃণালিনীর ঘরে নিয়ে আসে। বলে, 'পিসি, ও তোমার কাছে রইল। আমি আসছি—'

মৃণালিনী বোমার আওয়াজ এবং হল্লা শুনে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলেন। বলেন, 'নীচে কী হচ্ছে রে বুবু ? কারা বোমা ফাটাচ্ছে।'

'পরে এসে বলব। এখন দাঁড়াবার সময় নেই।' একসঙ্গে দু-তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে থাকে অদিতি।

পাশের বাড়ি গিয়ে একবার ডায়াল করতেই সৈকতকে পাওয়া যায়। সৈকত রীতিমত অবাক, 'আরে তুমি! কতদিন পর তোমার গলা শুনলাম! তবে তোমার খবর আমি রাখি। চুটিয়ে সমাজসেবা করে যাচ্ছ। লফটি আইডিয়ালস চোখের সামনে। তোমার জন্যে গর্ব হয়। তারপর যাক, এতদিন পর আমাকে মনে পড়ল! কেমন আছ বল—'

অদিতি বলে, 'ফিজিকালি অলরাইট। একটা বিপদে পড়ে তোমাকে ডিসটার্ব করছি ভাই, এক্ষুনি তোমার সাহায্য চাই।'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে সৈকত। সেই চমকের রেশ টেলিফোনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসে যেন, 'কী হয়েছে!'

দলবল নিয়ে নগেন কীভাবে ঝামেলা করছে, সমস্ত জানিয়ে অদিতি বলে, কিছু একটা ব্যবস্থা কর সৈকত—'

ব্যস্তভাবে সৈকত বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! তুমি লাইনটা ছেড়ে দাও। আমি বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে ফোন করে দিচ্ছি। দশ মিনিটের মধ্যে পুলিশ চলে যাবে তোমাদের বাড়ির অ্যাড্রেসটা দাও—'

ঠিকানাটা জানিয়ে দেয় অদিতি।

সৈকত এবার বলে, 'ঘণ্টাখানেক পর আবার ফোন করে কী হল না হল, খবরটা দিও। ডোণ্ট অরি—'

'খুব উপকার করলে। আই উড রিমেন এভার গ্রেটফুল টু ইউ।'

'আরে না না, তোমার এত করে বলার দরকার নেই। ইটস মাই ডিউটি। একদিন দেখা হলে ভাল লাগবে।'

'নিশ্চয়ই। আমি ঝঞ্ঝাটটা মিটিয়ে নিয়ে তোমার সঙ্গে খুব তাড়াতাড়িই যোগাযোগ করছি।'

'ও. কে। নগেনের ব্যাপারটা কী হল জানিও কিন্তু।'

'জানাব।'

ফোন নামিয়ে পাশের বাড়ি থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে নিজেদের বাড়ির গেটের দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় অদিতি। সেখানে তুলকালাম ব্যাপার চলছে এই মুহূর্তে।

মৃগাঙ্ক নগেনের গলার কাছটা জামাসুদ্ধ চেপে ধরে চিৎকার করছে, 'বাস্টার্ড', তোমার চামড়া গুটিয়ে ছাড়ব। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি—'

নগেনের মাথাতেও খুন চেপে গেছে। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হিংস্র গলায় সে বলে, 'শালা! অন্যের মেইয়েছেলেকে ঘরে পুরে রেখে ভদ্দরলোক সেজেছে! ভদ্দরলোকের আমি—' এরপর জঘন্য একটা খিস্তি করে সে।

'তোমার মুখ আমি তুবড়ে দেব শুয়োরের বাচ্চা।'

'যা যা মাকড়া, তোর মতো তুবড়েদেনেবালা আমি বহুত দেখেছি। নিজের

ভাল চাইলে চাঁপাকে বার করে দে। নইলে—'

একটা অ্যান্টিসোসাল তাকে তুই তোকারি করছে। মাথায় রক্ত ফুটতে থাকে মৃগাঙ্কর। ঝাঁপিয়ে পড়ে নগেনের গলা টিপে ধরে সে, 'নইলে কী?'

এবার ঝাড়া মেরে মৃগাঙ্কর হাতটা আলগা করে দেয় নগেন। বলে, 'তোমার লাইফ কিচাইন হয়ে যাবে। আমাকে তুমি চেনো না শালা!'

এদিকে বরুণও চেঁচাচ্ছিল, 'এই জানোয়ারেরা, ভাগ এখান থেকে—'

রমাপ্রসাদও হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চিৎকার করছিলেন। নগেনের সঙ্গে যারা এসেছে তারাও সমানে চিৎকার এবং খিস্তি করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রাস্তায় বোমা ফাটাচ্ছে।

এ পাড়ায় এমন ঘটনা অভাবিত। এখানে কেউ অন্যের ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করে না। কিন্তু আজ প্রতিটি বাড়ির জানালায় জানালায় অনেকের মুখ দেখা যাচ্ছে। তারা যতটা বিস্মিত তার চেয়ে ঢের বেশি সন্ত্রস্ত। পাড়ার চিরস্থায়ী শান্তিতে এভাবে বিঘ্ন ঘটবে, এটা কোনোক্রমেই তাদের কাছে কাম্য নয়।

এদিকে মৃগাঙ্ক আবার নগেনের দিকে দৌড়ে যায় এবং উন্মত্তের মতো তার মুখে ঘুষি চালিয়ে দেয়।

নগেনের নাক মুখ ভেঙেচুরে রক্তাক্ত মাংসের দলা হয়ে যায়। লাট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে নিজের রক্ত দেখে খুন চড়ে যায় তার! চোখ দুটো ঝলকে ওঠে। কোমরের কাছ থেকে লিকলিকে একটা ছোরা বার করেই মৃগাঙ্কর গায়ে বসিয়ে দেয় নগেন।

আতঙ্কে রমাপ্রসাদ, বরুণ, অনেকটা দূরে অদিতি চেঁচিয়ে উঠেছিল। মৃগাঙ্ক ক্ষিপ্র একটি মোচড়ে শরীরটাকে বাঁ দিকে হেলিয়ে দেয়। যদিও তার বুক ছিল নগেনের টার্গেট, সেখানে না বসে ছোরার ফলা মৃগাঙ্কর কাঁধে গেঁথে যায় এবং গরম তাজা রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে।

মৃগাঙ্কর শরীর মুহূর্তে কুঁকড়ে যায়। ঠোঁট কামড়ে হাত দুটোয় মুঠো পাকিয়ে যন্ত্রণা সামলাতে চেষ্টা করে সে কিন্তু পারে না। একসময় হাত পায়ের জোর আলগা হয়ে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে যায় সে।

শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশীরা দর্শক হয়ে কেউ আর নিজের নিজের বাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকে না। অনেকেই বেরিয়ে আসে কিন্তু ভয়ে কেউ এগুতে পারছে না। অন্যের জন্য অকারণে কে আর ঝুঁকি নিতে চায়?

বরুণ আর রমাপ্রসাদ মৃগাঙ্কর দিকে দৌড়ে যায়। অদিতি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। মৃগাঙ্কর এই পরিণতির যাবতীয় দায়িত্ব যে তারই, সেটা মেনে নিয়েই উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেও এগিয়ে যায়।

এদিকে ছুরি মারার পর একটু থমকে গিয়েছিল নগেন। হঠাৎ অদিতিকে দেখে সে কিছু বলতে যাবে, পুলিশের একটা কালো ভ্যান কর্কশ আওয়াজ

করে গেটের সামনে এসে ব্রেক কষে।

তৎক্ষণাৎ নগেন এবং তার গ্যাংটা উধাও হয়ে যায়।

ছ'জন আর্মড কনস্টেবল সঙ্গে করে অল্পবয়সী অফিসার ভ্যান থেকে নেমে মৃগাঙ্ককে দেখতে দেখতে বলে, 'কে এঁকে স্ট্যাব করল?'

ছুরি মারার খবর পেয়ে বাড়ি থেকে হেমলতা, মীরা এবং বন্দনা পাগলের মতো বেরিয়ে এসেছিল। তারা রক্তাক্ত বেহুঁশ মৃগাঙ্ককে পড়ে থাকতে দেখে বুকফাটা কান্না জুড়ে দেয়।

হাজার বিপদেও ধৈর্য হারায় না অদিতি। সে পুলিশ অফিসারকে একধারে ডেকে বলে, 'যাঁকে স্ট্যাব করা হয়েছে উনি আমার ছোটদা। পরে আপনাকে সব বলব, আপনি ছোটদাকে নিয়ে আগে কোনো হসপিটালে চলুন।'

মৃগাঙ্ককে ধরাধরি করে ভ্যানে তোলা হয়। তার সঙ্গে বন্দনা, মীরা, রমাপ্রসাদ, বরুণ ও অদিতিও ওঠে। হেমলতা আর মীরাকে বোঝানো হয়, পরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে, কিন্তু মীরাদের ভ্যান থেকে নামানো যায় না।

হাসপাতাল পর্যন্ত সারাটা পথ হেমলতা নিঃশব্দে কেঁদে যান। মীরা পাগলের মতো চিৎকার করে কাঁদতে থাকে এবং মৃগাঙ্কর এই অবস্থার জন্য যে অদিতিই একমাত্র দায়ী, সেটা কান্না জড়ানো ভাঙা ভাঙা গলায় এক নাগাড়ে বলে যায়।

রমাপ্রসাদ মীরাকে থামাতে চেষ্টা করেন, 'চুপ কর বৌমা, চুপ কর।'

মীরা কান্নার ভেতরেও ফুঁসে ওঠে, 'কেন চুপ করব? ওর যদি কিছু হয় আমি আপনার মেয়েকে ছাড়ব না। যতদূর যেতে হয়, যাব। এভাবে আমার সর্বনাশ করে দিলে—'

হাসপাতালে পৌঁছুবার পর ডাক্তাররা এমারজেন্সিতে ভর্তি করে নেন মৃগাঙ্ককে এবং পরীক্ষা করে জানান, প্রাণের আশংকা নেই, যদিও ছুরির ফলা কাঁধের মাংসপেশীগুলিকে খুবই জখম করেছে, রক্তপাতও হয়েছে প্রচুর। অবশ্য ডাক্তারদের ধারণা, মৃগাঙ্ককে চার পাঁচদিনের বেশি হাসপাতালে থাকতে হবে না, তার পরেই তাকে রিলিজ করে দেওয়া হবে। বাড়িতে সপ্তাহখানেক রেস্ট নিলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে সে।

অদিতিরা হাসপাতালে থাকতে থাকতেই জ্ঞান ফিরে আসে মৃগাঙ্কর এবং তাকে এমারজেন্সি থেকে পেয়িং বেডে নিয়ে যাওয়া হয়।

এইসব করতে করতে ঘণ্টাদুয়েক কাটে। তারপর একটা ট্যাক্সি করে মীরা আর হেমলতাকে নিয়ে বরুণ বাড়ি ফিরে যায়। রমাপ্রসাদ এবং অদিতি পুলিশ-ভ্যানে থানায় আসে এবং সকালের ঘটনাটি আদ্যোপান্ত জানিয়ে

নগেনের নামে ডায়েরি করিয়ে বলে, 'লোকটা খুবই বিপজ্জনক

তরুণ পুলিশ অফিসারটি বলে, 'কোনো সন্দেহ নেই।'

'আমাদের ক্ষতি করতে পারে। হয়ত আবার দলবল নিয়ে হানা দেবে।'

'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, নগেনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যারেস্ট করা হবে। আমি আপনাদের বাড়ির সামনে পুলিশ পোস্ট করে দিচ্ছি। চিন্তা করবেন না।'

অদিতি বলে 'ধন্যবাদ। আপনার এখান থেকে আমি কি একটা ফোন করতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।' ব্যস্তভাবে টেলিফোনটা অদিতির দিকে এগিয়ে দেয় পুলিশ অফিসার।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে পুলিশ অদিতিদের বাড়ি যাবার পর কী হল না হল, সব জানিয়ে দিতে বলেছিল সৈকত। সে নিশ্চয়ই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। ডায়াল ঘুরিয়ে লালবাজারে কানেকশান পেয়ে যায় অদিতি। লাইনের ওধার থেকে সৈকতের গলা ভেসে আসে, 'হ্যালো—'

'অদিতি বলছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বল।'

পুলিশ আসার পর এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব বলে গেল অদিতি।

সৈকত বলে, 'আপাতত তা হলে সমস্যা মিটল।'

অদিতি বলে, 'তুমি সাহায্য না করলে আরো বিপদে পড়ে যেতাম।'

'আমি পুলিশ পিকেটের কথা বলে দিয়েছি। আশা করি আর কোনো ট্রাবল হবে না।'

'মনে হচ্ছে। তবে ছোটদা মাঝখান থেকে ইনজিওরড হয়ে গেল।'

'ভাল কাজ করতে গেলে ওরকম একটু আধটু হয়েই থাকে।'

অদিতি উত্তর দেয় না। সে কী করে বলবে, মৃগাঙ্কর এই জখম হওয়ার ঘটনায় তাদের ফ্যামিলিতে কী ধরনের ঝড় বয়ে যাবে। সম্ভাব্য সেই ঘটনার কথা ভাবতেই সে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

একটু ভেবে এবার সৈকত বলে, 'আগে যে ফোন করেছিলে তখন একটা কথা জানা হয়নি—'

'কী ?'

'নগেন তোমাদের বাড়ির ঠিকানা পেল কোথায় ?'

একটু চিন্তা করে অদিতি বলে, 'জানি না। তবে আমার ধারণা ও আরও একবার 'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে গিয়েছিল। ওখানে যে কাজের লোকটা থাকে তাকে ভয় দেখিয়ে ঠিকানাটা নিয়েছে। কিংবা অন্য কারো থেকেও যোগাড় করতে পারে।'

সৈকত বলে, 'যাই হোক, লোকটা খুব ডেসপারেট। অবশ্য ওকে অ্যারেস্ট

করতে অসুবিধে হবে না। যদি দরকার হয়, পরে আমাকে ফোন করো।'

'আচ্ছা।'

খুট করে একটা শব্দ ভেসে আসে। সৈকত ফোন নামিয়ে রেখেছে।

দশ

বিয়ের ব্যাপারে অদিতি সিতাংশুকে নাকচ করে দেবার পর থেকেই বাড়ির আবহাওয়া থমথমে হয়ে গিয়েছিল। নগেন মৃগাঙ্ককে ছুরি মারলে সেটা একেবারে বিস্ফোরণের পর্যায়ে চলে আসে। এই ঘটনার জন্য মৃণালিনীকে বাদ দিলে বাড়ির প্রতিটি মানুষ, বিশেষ করে মীরা আঙুল তুলে আগেই অদিতিকে দায়ী করেছে। শুধু তাই না, মা বাবা বড়দা এবং বৌদিরা দিনরাত সমস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, চাঁপাকে বার করে দিতে হবে। সে এখানে থাকলে বাড়ির লোকেদের যে আরও মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে, এতে কারও এতটুকু সংশয় নেই। উটকো ঝামেলা ঘরে পুষে রেখে নিজেদের অকারণে বিপন্ন করতে কে-ই বা চায়?

প্রচণ্ড জেদে গোটা বাড়ির বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ চালিয়ে যায় অদিতি। যত চাপই আসুক, চাঁপাকে কিছুতেই তাড়িয়ে দিতে পারবে না। সে এ বাড়িতেই থাকবে। মৃণালিনীও ভাইঝিকে সমর্থন জানিয়ে যান।

অদিতি বোঝাতে চেষ্টা করে, কেন তোমরা এত ভয় পাচ্ছ? লালবাজারে আমার বন্ধু আর এখানকার থানার অফিসার জানিয়েছে, খুব শিগগিরই নগেনকে অ্যারেস্ট করা হবে। তাছাড়া আমাদের বাড়িতে আর্মড গার্ডের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

রমাপ্রসাদ বলেন, 'তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। আমাদের আত্মীয় না, স্বজন না, চেনা-জানাও না, এমন একটা মেয়ের জন্যে ফ্যামিলি পীস ডিসটার্বড হোক, এটা আমি একেবারেই চাই না। তুই ওকে যেখান থেকে এনেছিস সেখানে দিয়ে আয়।'

অদিতি বলে, 'না, কিছুতেই না।' তার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে বেরোয়।

হেমলতা বলেন, 'খুব বাড়াবাড়ি করছিস বুবু।'

যে মায়ের গলা কোনোদিন কোনো কারণেই একটা বিশেষ সীমারেখার ওপর ওঠে না, হঠাৎ তাঁকে এভাবে বলতে দেখে হকচকিয়ে যায় অদিতি। সে বলে, 'মা আমি একটা মেয়েকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি। তুমি একে বাড়াবাড়ি বলছ!'

হেমলতা বলেন, 'ওকে বাঁচাতে গিয়ে যদি আমাদের কারও সর্বনাশ হয়ে যায়, সেটা কিছুতেই মানব না। ছুরিটা বাবলুর কাঁধে না লেগে বুকে লাগলে কি হত, আগে তার জবাব দে।'

অদিতি বুঝতে পারছিল, মৃগাঙ্ককে ছুরি মারার ঘটনায় হেমলতা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। এটা মায়ের আশঙ্কা এবং আবেগের ব্যাপার। যুক্তি-তর্ক বা সামাজিক দায়িত্ববোধের ব্যাপারগুলো তাঁর মাথায় কিছুতেই ঢোকানো যাবে না। ছেলেমেয়ে বা স্বামীর নিরাপত্তা তাঁর কাছে সবার ওপরে। সেখানে অন্য সমস্ত কিছুই তুচ্ছ।

রমাপ্রসাদ বলেন, 'তাহলে একটা কাজ করা যাক।'

সন্দিগ্ধভাবে বাবার দিকে তাকায় অদিতি, 'কী?'

'তুই ওকে হাতে ধরে নিয়ে এসেছিস, তাই বলতে পারছিস না। আমরাই না হয় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে ওর স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিই।'

ধৈর্যের একটা সীমা আছে। অদিতি টের পায় সেটা সে পার হয়ে যাচ্ছে। রূঢ় গলায় বলে, 'না, কিছুতেই না।'

অসহ্য রাগে রমাপ্রসাদের কণ্ঠমণিটা ওঠা নামা করতে থাকে। চারপাশ থেকে কয়েক জোড়া জ্বলন্ত চোখ তাকে যেন পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

অদিতি জানে সে বাড়ি থেকে বেরুলেই চাঁপাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। তাই একটি মুহূর্তের জন্যও সে বাইরে যাচ্ছে না। সারাক্ষণই চাঁপাকে আগলে আগলে রাখছে। এইভাবে দিন দুই কেটে যায়।

কিন্তু সে একটা চাকরি করে। ইচ্ছেমতো কলেজে ছুটি নিলে চলে না। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা এসে যাচ্ছে। অনার্সের কোর্স বেশ খানিকটা পড়ানো হয়নি। হাতে আর আছে ছটি মাস। এর ভেতর কোর্স শেষ করে দিতে হবে। রেগুলার ক্লাস ছাড়াও টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলো রয়েছে। এখন একটা দিনও না গেলে ছেলেমেয়েদের দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে।

তবু দুটো দিন চাঁপাকে নিয়েই রইল অদিতি। কিন্তু আজ সকালে প্রিন্সিপাল পাশের বাড়িতে ফোন করে জানিয়েছেন, অদিতি যেন অবশ্যই কলেজে আসে। দুদিন ক্লাস না হওয়ায় ছেলেমেয়েরা ভীষণ ক্ষুব্ধ, তারা প্রিন্সিপালের ঘরে এসে খুব হইচই করেছে।

অগত্যা, চাঁপাকে ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকতে বলে দশটা নাগাদ যখন অদিতি বেরুতে যাবে চাঁপা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'দিদি, আপনি কখন ফিরবেন?'

অদিতি বলে, 'পাঁচটার ভেতর। ক্লাস হয়ে গেলে এক মিনিটও দেরি করব না। সাবধানে থাকবে।'

'কিন্তু—'

'বল।'

'একটা কাজ করলে হয় না, যদি আপনার অসুবিধা না হয়—'

'কী?'

'আপনার সঙ্গে আমায় যদি কলেজে নিয়ে যান—'

এ কথাটা আগেই ভেবে দেখেছে অদিতি। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কেননা কলেজে চাঁপাকে নিয়ে গেলে সহকর্মীদের কৌতূহল চাগিয়ে উঠবে। ফলে নানারকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সেটা তার এবং চাঁপার পক্ষে ভীষণ অস্বস্তিকর। অদিতি বলে, 'তুমি বাড়িতেই থাকো।'

'আমার খুব ভয় করছে। যদি—' বলতে বলতে চুপ করে যায় চাঁপা।

চাঁপা আসায় বাড়িতে যে দমবন্ধ-করা যুদ্ধকালীন অবস্থা চলছে, সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিসুদ্ধি তার আছে। অদিতি ভরসা দিয়ে বলে, 'কিসের ভয়? আমি দুর্গাকে বলে যাচ্ছি, তোমার ভাত দিয়ে যাবে।'

চাঁপা বলে, 'এভাবে কদিন আমাকে আগলে রাখবেন?'

এই প্রশ্নটার উত্তর জানা নেই অদিতির। সে বলে, 'এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। কিছু একটা ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা যাচ্ছি।'

কলেজে এসে পর পর দুটো অনার্স ক্লাস নিয়ে আগের দু-দিনের যেসব ক্লাস নেওয়া হয়নি তার থেকে দুটো ক্লাস নিল। সে ঠিকই করে রেখেছে, রোজ একটা-দুটো করে এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে মেক-আপ করে ফেলবে।

একটানা চারটে ক্লাস নেবার পর স্টাফ রুমে আসতেই অরুণা বলে, অদিতিদি, বিকাশবাবু তিন বার ফোন করেছেন। উনি অফিসে চারটে পর্যন্ত থাকবেন। তোমাকে রিং করতে বলেছেন।' অরুণা এই কলেজে হিস্ট্রি পড়ায়, বিকাশকে চেনে। শুধু সে কেন, অদিতির সহকর্মীদের সবাই বিকাশকে চেনে। অদিতিই তাদের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছে। সে যথেষ্টই প্রাপ্তবয়স্ক। সদ্য কিশোরীদের ভীরু এবং গোপন প্রেমের মতো দুজনের সম্পর্কটা অদিতি লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করে না।

দুদিন বিকাশের সঙ্গে দেখা হয়নি। শুধু বিকাশ কেন, বাইরের সবার সঙ্গেই অদিতির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই দুটো দিন সারাক্ষণ চাঁপাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে সে।

স্টাফ রুমের এক কোণে উঁচু একটা টুলের ওপর টেলিফোনটা রয়েছে। অদিতি উঠে সেখানে চলে যায়, বার তিনেক ডায়াল করার পর বিকাশকে ধরতে পারে।

বিকাশ বলে, 'কী ব্যাপার, দুদিন তোমার দেখা নেই। কলেজে কাল পরশু ফোন করলাম। 'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে রোজ যাচ্ছি। কেউ কোনো খবর দিতে পারছে না। আজ অফিসে আসার পর রমেনের ফোন পেলাম। ও বলছিল, তোমাদের বাড়িতে নাকি কারা রেইড করেছিল। কী হয়েছিল?' তার কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠার ছাপ।

মৃগাঙ্ককে ছুরি মারার ঘটনা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যা যা হয়েছে সংক্ষেপে সমস্ত জানিয়ে অদিতি বলে, 'বুঝতেই পারছ কেন আমাকে বাড়িতে আটকে থাকতে হয়েছিল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু—'

'কী?'

'এভাবে কতদিন চলবে?'

আজ কলেজে আসার আগে ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছিল চাঁপা। খানিক্ষণ চুপ করে থেকে অদিতি বলে, 'যতদিন না সমস্যাটার কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।'

বিকাশ বলে, 'কিন্তু ব্যাপারটা খুব কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল যে।' তার গলা শুনে মনে হয় খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

অদিতি হাসে, 'সহজ সরল হলে সেটা আবার সমস্যা থাকে নাকি?'

অনিশ্চিতভাবে বিকাশ বলে, 'তা অবশ্য।' একটু থেমে আবার বলে, 'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া খুব দরকার। জানো, হাউসিং বোর্ড থেকে কাল আমার, মানে আমাদের ফ্ল্যাটটার পজেসান দিয়েছে।'

হঠাৎ মৃদু উত্তেজনা অনুভব করে অদিতি। চাঁপার মুখটা বিদ্যুৎচমকের মতো এক পলক তার চোখের সামনে ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। বলে, 'এত তাড়াতাড়ি দিয়ে দিল?'

বিকাশ বলে, 'তুমি সেদিন বলার পর হাউসিং বোর্ডে গিয়ে খুব ধরাধরি করেছি! বলেছি, ফ্ল্যাট না পেলে বিয়েটা আটকে যাচ্ছে—' বলতে বলতে তার গলা তরল এবং হাল্কা শোনায়।

বিকাশের তারল্য বা লঘুতা অদিতির ওপর বিশেষ দাগ কাটে না। ফের চাঁপার সমস্যা তার মস্তিষ্কে ফিরে আসে। সে অন্যমনস্কর মতো বলে, 'একটা ভাল খবর দিলে।'

'এখন ফ্ল্যাটটা তো সাজাতে হবে। কাল একজন ইন্টেরিওর ডেকরেটরের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা মান্থলি ইনস্টলমেন্টে সব কিছু করে দিতে চাইছে। এই চান্সটা আমাদের নেওয়া উচিত। তবে—'

'কী?'

'কীভাবে ঘর সাজানো হবে, ওয়ার্ডরোব, খাট, ডাইনিং টেবল—এ-সব কিরকম ডিজাইনের হবে, কোন ঘরে কী রাখা হবে, তুমি বলে না দিলে ডেকরেটর কিছু করতে পারবে না। তোমার সঙ্গে ডেকরেটরের কথা হওয়া দরকার। বেস্ট হত, তুমি যদি এর মধ্যে সময় করে একদিন ফ্ল্যাটে আসতে, ডেকরেটরকেও তখন আসতে বলতাম।'

অদিতি চুপ করে থাকে।

বিকাশ গভীর আগ্রহে এবার বলে, 'কবে আসতে পারবে ?'

অদিতি বলে, ঠিক বলতে পারছি না। যাবার আগে তোমাকে ফোন করব।'

অদিতির নিস্পৃহতা বিকাশকে যেন খানিকটা ক্ষুণ্ণই করে! সে বলে, 'ফোনটা একটু তাড়াতাড়ি করতে চেষ্টা করো।'

'আচ্ছা—'

'আরেকটা কথা, অমিতাদি তোমার জন্যে খুব ওরিড। তাঁকে একটা রিং করো। আজ তোমার ফোন না পেলে কাল উনি তোমাদের বাড়ি যাবেন।'

'অমিতাদি বাড়িতে এলে খুব ভাল লাগবে। অবশ্য আমি এক্ষুনি ওঁকে ফোন করছি।'

'রাখলাম—'

'ঠিক আছে।'

এবার ইউনিভার্সিটিতে ফোন করে একেবারেই অমিতাদিকে পেয়ে যায় অদিতি।

সব শোনার পর অমিতাদি বলেন, 'খুব বিপদ হল তো।'

কণ্ঠস্বরে মনে হয় অমিতাদি খুবই উদ্বিগ্ন। বিকাশকে যা বলেছে প্রায় সেই কথাগুলোই অদিতি আবার বলে।

'তা একটু তো হবেই। যা চিরকাল চলে এসেছে তার বিরুদ্ধে গেলে কেউ কি তা মেনে নিতে চায়? স্থিতাবস্থাকে ডিস্টার্ব করলে কেউ মেনে নিতে পারে না। সে যাক, আমি ঠিকই করে ফেলেছি, প্রবলেম যখন এসেছে তখন ফেস করব।'

'একটা কথা বলব অদিতি ?'

'বলুন না—'

'তুমি চাঁপাকে ওদের বস্তিতে ফেরত পাঠিয়ে দাও।'

অদিতির মনে হয়েছিল, ঠিক এমনই কিছু একটা বলবেন অমিতাদি। আগেও তিনি এবং 'নারী-জাগরণ'-এর আরো অনেকেই এ জাতীয় পরামর্শ দিয়েছে। বাড়ির লোকেরা তো চাঁপাকে বার করে দেবার জন্য প্রথম দিন থেকেই তার ওপর প্রচণ্ড চাপ দিয়ে যাচ্ছে। আসলে সবাই নারীমুক্তি নারীমুক্তি করে গরম গরম স্লোগান আর বক্তৃতা দিয়েই কর্তব্য শেষ করে ফেলতে চায়। কঠোর সমস্যা যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তাদের চেহারা যায় পাল্টে। তাদের ভেতর থেকে চিরকালের এসকেপিস্টরা বেরিয়ে পড়ে।

অমিতাদির কথায় উত্তেজিত হয় না অদিতি। খুব শান্ত গলায় বলে,

'এখন আর তা সম্ভব না। আমি যখন ওকে বস্তি থেকে নিয়েই এসেছি, শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই।'

'ফাইট টু ফিনিশ?'

'রাইট।'

'একটা মেয়ের জন্যে না হয় তুমি লড়াই করলে, কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে চাঁপার মতো হাজার হাজার মেয়ে রয়েছে। তাদের সবার জন্যে তো এই মুহূর্তে কিছু করতে পারছ না।'

এই কথাগুলোও নতুন না। আগেও কয়েকজনের মুখে শুনেছে অদিতি। সে বলে, 'একজনকে দিয়েই শুরু করা যাক না। যদি তেমন কিছু করে উঠতে পারি, অনেকেই এগিয়ে আসবে।' একটু ভেবে বলে, 'নারী-জাগরণ' যদি চাঁপার ব্যাপারে ইন্টারেস্ট না নেয়, আমি একাই যা পারি করব অমিতাদি।'

অমিতাদি চকিত হয়ে ওঠেন, 'না না, ইন্টারেস্ট নেবে না কেন? তুমি আমাদের ভুল বুঝো না। তবে এমন একটা জটিল ব্যাপার, সব দিক তো ভেবে দেখতে হবে।'

অত্যন্ত উদাসীন ভঙ্গিতে অদিতি বলে, 'তা তো বটেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অমিতাদি বলেন, 'তুমি 'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে কবে আসতে পারবে?'

অদিতি বলে, 'যত তাড়াতাড়ি পারি। বস্তির সেই সার্ভের কাজটা সবে আরম্ভ করেছিলাম। চাঁপার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে ওটাও আবার নতুন করে স্টার্ট করতে হবে।'

'কিন্তু ওখানে নগেন থাকে—' অমিতাদির গলা শুনে মনে হয় তিনি বেশ সন্ত্রস্ত।

'থাক না। ক্রিমিনালরা বেসিকালি কাওয়ার্ড হয়। ভয় পেয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিলে পৃথিবীতে কোনো কাজই আর করা সম্ভব হবে না।'

'ঠিক আছে, তুমি এলে এ নিয়ে কথা হবে। আমাদের মেম্বাররা তোমার জন্যে ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছে।'

ফোন নামিয়ে আর দেরি করে না অদিতি। ব্যাগ এবং ছেলেমেয়েদের অ্যানসার পেপারের একটা বাণ্ডিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

এগার

বাড়ির কাছে এসে গেটের পাশে চাঁপাকে বসে থাকতে দেখে থমকে যায় অদিতি। ভয়ে এবং আশঙ্কায় সিঁটিয়ে আছে মেয়েটা।

কী হতে পারে চাঁপার? কেন সে রাস্তায় বসে আছে? তবে কি তাকে নিয়ে বাড়িতে নতুন কোন ঝঞ্ঝাট হয়েছে? ঝাঁক বেঁধে এইসব প্রশ্ন অদিতির মাথার ভেতর ঢুকে তাকে বিচলিত এবং অস্থির করে তোলে। প্রায় দৌড়েই সে চাঁপার কাছে চলে আসে। বলে, তুমি এখানে!'

চাঁপা উত্তর দেয় না।

অদিতি বলে, 'তোমাকে না বলেছিলাম আমার ঘর থেকে বেরুবে না।'

চাঁপা এবারও চুপ। তার ঠোঁট দুটো শুধু কাঁপতে থাকে এবং দু চোখ জলে ভরে যায়।

অদিতি সামনের দিকে ঝুঁকে বলে, 'জবাব দিচ্ছ না কেন?'

কোনো রকমে ঝাপসা গলায় চাঁপা বলতে পারে, 'আমি—আমি—'

চাঁপার হাত ধরে টেনে তোলে অদিতি। প্রবল উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে?'

চাঁপা কিছু বলে না, মুখ নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

অদিতি আবার বলে, 'কী হল, কথা বলছ না কেন?' তাকে বেশ অসহিষ্ণু দেখায়।

ভাঙা ভাঙা জড়ানো গলায় এবার চাঁপা বলে, বড়দা বাবা আর বৌদিরা আমাকে বার করে দিয়েচে।'

অদিতি চমকে ওঠে, 'কখন?'

'আপনি কলেজে যাবার পর।'

'তারপর থেকে এখানে বসে আছো?'

'হ্যাঁ।'

অদিতি দ্রুত বাঁ-হাতের কব্জি উল্টে ঘড়িটা দেখে নেয়। তিনটে বেজে কুড়ি। সে বেরিয়েছে দশটায়। তার মানে পাঁচ ঘণ্টা কুড়ি মিনিট মেয়েটা রাস্তায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'আমি বেরুবার পর কোনো গোলমাল হয়েছিল কি?'

'না।'

'তুমি ঘর থেকে বেরিয়েছিলে?'

'না।'

'তা হলে তোমাকে বার করে দেওয়া হল যে?'

'জানি না। হঠাৎ ওনারা এসে দরজা খুলতে বলল। আমি ভয়ে ভয়ে খুলে দিলাম। ওনারা বলল, এই মুহূর্তে দূর হয়ে যাও। নইলে পুলিশ ডাকব। পুলিশের নামে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তবু বললাম, ছোটদি আমাকে এখানে থাকতে বলেচে। শুনে ওনারা রেগে গিয়ে গালাগাল দিতে শুরু করলে যে থাকতে সাহস হল না। অবিশ্যি—'

'কী?'

'পাশের ঘর থেকে পিসিমা সমানে বলে যাচ্ছিল আমাকে যেন তাড়িয়ে না দেয়। কিন্তু তেনার বিছানা ছেড়ে নামার ক্ষ্যামতা নেই। এদিকে বস্তিতে যে ফিরে যাব, ভরসা হলনি। যদি—'

শুনতে শুনতে মুখ শক্ত হয়ে ওঠে অদিতির। পঙ্গু শয্যাশায়ী পিসিমা ছাড়া বাড়ির প্রতিটি মানুষ চাঁপার বিরুদ্ধে। তার জন্য বিন্দুমাত্র সহানুভূতি কারও নেই। এদিকে সারাক্ষণ তাকে পাহারা দিয়ে বাড়িতে বসে থাকার মতো পর্যাপ্ত সময়ও নেই অদিতির। তার কলেজ আছে, 'নারী-জাগরণ' আছে। বাইরে হাজার রকম কাজ আছে। তাকে বেরুতেই হবে। যদি জোর করে চাঁপাকে আবার বাড়িতে নিয়েও যায়, সে যখন বাইরে বেরুবে, বাবা দাদা এবং বৌদিরা নিশ্চয়ই ফের তাকে তাড়িয়ে দেবে। তাতে তিক্ততা আর অশান্তিই শুধু বাড়বে।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'দুপুরে তোমার তো খাওয়া হয়নি।' বলেই খেয়াল হয় প্রশ্নটা বোকার মতো করে ফেলা হয়েছে। বাবা কি দাদা যাকে বার করে দিয়েছে তাকে নিশ্চয়ই তোয়াজ করে খাওয়ানোর কথাই ওঠে না। চাঁপার কাছে কিছু খাবার দাবার কেনার মতো পয়সাও হয়তো নেই, থাকলেও এইরকম মানসিক অবস্থায় খাওয়ার কথা সে ভাবতে পারে না।

চাঁপা মুখ নামিয়ে চুপ করে থাকে।

রাস্তায় দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ ভেবে ভবিষ্যৎ কার্যসূচি ঠিক করে নেয় অদিতি। সে জানে বিকেল চারটে পর্যন্ত আজ অফিসে থাকবে বিকাশ। তার আগেই তাকে ফোন করা অত্যন্ত জরুরি। ফোনটা করার পর চাঁপাকে কোথাও খাইয়ে নিতে হবে। তারপর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে তার বোঝাপড়া আছে। যাকে বাড়িতে এনে আশ্রয় দিয়েছে তাকে সবাই মিলে তাড়িয়ে দেবে, এটা সে কিছুতেই মেনে নেবে না। অন্তত একটা জোরালো প্রতিবাদ করতেই হবে।

অদিতি বলে, 'তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি আসছি।'

চাপা ভীর্ গলায় বলে, 'দিদি একটা কথা বলব ?'

'বল—'

'আমার জন্যে বাড়িতে গিয়ে রাগারাগি করবেন না।'

চাঁপার মনোভাব ব্ঝতে অসুবিধে হয় না। ইদানীং এ বাড়িতে যেসব অশান্তি এবং দ্র্ঘটনা ঘটেছে তার কারণ সে। এজন্য মেয়েটা লজ্জায় সঙ্কোচে একেবারে কুঁকড়ে আছে।

অদিতি বলে, 'ঠিক আছে, এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।' বলে বাড়ির ভেতর ঢ্কে পড়ে। তারপর পেছন দিক দিয়ে পাশের বাড়ি চলে যায়। ওখান থেকে বিকাশকে ফোনে ধরতে হবে।

এক ঘণ্টা আগে যার সঙ্গে কথা হয়েছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে আবার তার ফোন পেয়ে বেশ অবাকই হয়ে যায় বিকাশ। বলে, 'কী ব্যাপার !'

অদিতি বসে, 'চারটের সময় তুমি তো বেরিয়ে যাবে ?'

'হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে আমার যে অংশটা রয়েছে সেটা দাদাকে বিক্রি করে দিচ্ছি। ওই ব্যাপারে আমাদের ল-ইয়ার এগ্রিমেন্ট ড্রাফট করে রেখেছেন। সেটা দেখাতে যাব।'

দ্বিধান্বিতভাবে অদিতি বলে, 'খ্ব ম্শকিল হল যে ?'

'কিসের ম্শকিল ?' একটু যেন অবাকই হয় বিকাশ।

সরাসরি উত্তর না দিয়ে অদিতি বলে, 'আজ ল-ইয়ারের কাছে না গিয়ে কাল গেলে খ্ব অসুবিধা হবে ?'

'কেন ?'

'তোমার সঙ্গে আজ আমার দেখা হওয়াটা ভীষণ জর্রি।'

'হঠাৎ কী হল ? কিছ্ক্ষণ আগে যখন কথা বললাম তখন তো এত আর্জেন্সির কথা জানাওনি।'

অদিতি বলে, 'হঠাৎ নতুন একটা ডেভলপমেন্ট হয়েছে।'

'কী ডেভলেপমেন্ট ?' বিকাশের কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ।

'ফোনে বলা যাবে না। দেখা হলে শ্নো।'

'ঠিক আছে, ল-ইয়ারকে ফোন করে দিচ্ছি, কালই যাব। এখন বল, আমাকে কী করতে হবে ?'

'তুমি অফিস থেকে সোজা গলফ গ্রীনের নতুন ফ্ল্যাটে চলে যেও। আমি ঘণ্টাখানেকের ভেতর ওখানে পেঁছে যাব।'

'আচ্ছা।'

ফোন নামিয়ে সোজা চাঁপার কাছে এসে তাকে সঙ্গে করে বড় রাস্তায় একটা খাবারের দোকান থেকে খাইয়ে নিয়ে আসে অদিতি। তারপর তাদের বাড়ির গেটের কাছে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে ঢোকে।

বাবা মা বড়দা এবং দুই বৌদি দোতলাতেই ছিল। অদিতি তীব্র গলায় বলে, 'এ বাড়িতে আমার কি সামান্য অধিকারও নেই?'

বরুণের চোখ কুঁচকে যায়। সে বলে, 'তার মানে?'

'আমি একটা অসহায় মেয়েকে আমার ঘরে এনে রাখলাম, আর তোমরা তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলে?'

'আমাদের ফ্যামিলির সিকিউরিটি নষ্ট হয়, এ হতে দেওয়া যায় না।'

অদিতির মাথার ভেতর কোথায় যেন বারুদের স্তূপে আগুন ধরে যায়। সে বলে, 'আর তোমরা ফ্যামিলির জন্যে কী করতে যাচ্ছ? একটা বজ্জাত ডিবচের কাছে আমাকে বেচতে যাচ্ছিলে। ষড়যন্ত্রটা কেঁচে গেছে। আমার ধারণা এখন টাকার জন্যে ওই লোকটা এ বাড়ির সবাইকে লাথি মেরে রাস্তায় বার করে দেবে। আর তার জন্যে দায়ী হবে তোমরা।' একটু থেমে বলে, এতগুলো লোকের সিকিউরিটির কথা ভেবে দেখেছ?'

রমাপ্রসাদ গলা চড়িয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই এ বাড়িতে তোমার অধিকার আছে। তাই বলে এভাবে তুমি কথা বলবে না বুবু! বড়দের সম্মান দিতে শেখো—'

অদিতি বলে, 'বড়দের উচিত এমন দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাতে ছোটরা সম্মান করতে বাধ্য হয়। সে যাক, একটা পরিষ্কার কথা জানতে চাই, তোমরা চাঁপাকে এখানে থাকতে দেবে কিনা—'

'না, কিছুতেই না। তোমাকে এ ব্যাপারে আগেই তো বলেছি। আমাদের নিজেদেরই যথেষ্ট প্রবলেম আছে। চাঁপা থাকা মানেই নিত্যনতুন ঝামেলা।'

'ঠিক আছে, তাহলে আমাকেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়।'

হেমলতা ওধার থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কী বলছিস বুবু? তোর মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল!'

রমাপ্রসাদ বলেন, 'একটা উটকো মেয়ের জন্যে কেন এত জেদ ধরে আছিস?'

অদিতি বলে, 'বাবা শুধু চাঁপার জন্যেই না, আমার নিজের জন্যেও আমাকে এ বাড়ি ছাড়তে হবে। আমার অজান্তে সেদিন তোমরা আমাকে একটা বদমাসের হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত করেছিলে সেদিনই ভেবেছিলাম এই পরিবেশে থাকা ঠিক না। ভবিষ্যতে আমার সম্বন্ধে তোমরা কী করবে জানি না। হয়ত আরো কিছুদিন থাকতাম। কিন্তু চাঁপার ব্যাপারের পর তোমরা যা করলে তাতে ডিসিশানটা নিতেই হল।'

হেমলতা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এসে অদিতির দুই হাত ধরে বলেন,

কোথাকার কে একটা মেয়ে, তার জন্যে বাপ-মা, বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যাবি বুবু ?' বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন।

মায়ের কণ্ঠটা খুবই আন্তরিক। নরম গলায় অদিতি বলে, 'একটু আগে তো বললাম, চাঁপার জন্যে না, নিজেকে বাঁচাতে আমাকে এ বাড়ি ছাড়তেই হবে।'

অদিতি যে বাবা আর ভাইদের বিশ্বাস করে না, সেটা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ চারিদিকে অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে আসে।

হেমলতা মেয়ের দিকে সন্ত্রস্ত মুখে তাকিয়ে ছিলেন। অদিতিকে তাঁর মতো কে আর বেশি চেনে। যেমন জেদী তেমনি একগুঁয়ে। সিদ্ধান্ত যা সে নিয়েছে সেখান থেকে তাকে ফেরানো যাবে না।

হেমলতা ব্যাকুল হয়ে বলেন, 'কোথায় যাবি তুই ?'

এই মুহূর্তে বাড়ির আবহাওয়া যেরকম তাতে বিকাশের নাম বললে মারাত্মক কিছু ঘটে যাবে। অদিতি বলে, 'পরে জানাব।'

এরপর রমাপ্রসাদ, বন্দনা, এমন কি মীরা আর বরুণও অদিতিকে আটকাবার চেষ্টা করে। তারা বলে, এভাবে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া ভাল দেখায় না, লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না, ইত্যাদি। কিন্তু অদিতি অনড় থাকে। সে বলে, 'কাল-পরশু এসে আমার জিনিসপত্র নিয়ে যাব।'

হেমলতা বলেন, 'তুই কি এ বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে দিলি বুবু ?'

'কে বললে শেষ করে দিলাম। দু-চারদিন পর পর এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাব।' বলে আর দাঁড়ায় না অদিতি। সোজা তেতলায় গিয়ে একটা সুটকেসে কিছু জামা-কাপড়, ব্রাশ, পেস্ট, এমনি টুকিটাকি দরকারী জিনিস পুরে মৃণালিনীর ঘরে যায়।

মৃণালিনী সুস্থ হাতটা দিয়ে ভাইঝিকে আঁকড়ে ধরে বলেন, 'দুর্গা এসে বলে গেল তুই নাকি চলে যাচ্ছিস ?'

অদিতি বলে, 'তুমিই বল, আমার কী করা উচিত ?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন না মৃণালিনী। পরে বলেন, 'হ্যাঁ, চলেই যা। তবে সময় পেলেই চলে আসবি। এখানকার অধিকার ছাড়বি না।'

অদিতি জানায়, ছাড়বে না।

মৃণালিনী বলেন, 'চাঁপাকে তখন ওরা জোর করে তাড়িয়ে দিল। গেটের কাছে বসে ছিল, তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?'

'হয়েছে। ওকে নিয়েই যাচ্ছি।'

'কোথাও উঠবি ঠিক করেছিস ?'

একটু চুপ করে থাকে অদিতি। তারপর বলে, 'তোমাকে তো বিকাশের কথা বলেছি।'

মৃণালিনী বলেন, 'হ্যাঁ।'

'ও একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। সবে পজেসান পেয়েছে। আপাতত ওখানেই ওঠার ইচ্ছা। যদি অসুবিধা হয় দু-একদিনের জন্যে কোনো বন্ধুর বাড়িতে থাকব। তারপর লেডিজ হোস্টেলের ব্যবস্থা করে নেবো।'

'কী হল না হল আমাকে জানিয়ে যাস। নইলে ভীষণ দুশ্চিন্তায় থাকব।'

'তোমাকে তো জানাতেই হবে পিসি।' বলতে বলতে অদিতির গলা ভারী হয়ে আসে।

মৃণালিনীর দুই চোখ জলে ভরে যায়।

গলফ গ্রীনের ফ্ল্যাটে আগে আর আসেনি অদিতি। তবে বিকাশের কাছ থেকে ঠিকানাটা জেনে নিয়েছিল। চাঁপাকে সঙ্গে করে খুঁজে খুঁজে ফ্ল্যাটটা যখন সে বার করল, কলকাতা মেট্রোপলিসের ওপর সন্ধে নামতে বেশি দেরি নেই। এখনও কলিং বেল লাগানো হয়নি। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়ায় বিকাশ। অদিতিরা পৌঁছুবার আগেই সে এখানে এসে বসে আছে। দারুণ খুশিতে তার চোখমুখ ঝকমক করছে। অদিতির জন্য অসীম ধৈর্য নিয়ে চার-পাঁচটা বছর সে অপেক্ষা করেছে। এত দিনে কাম্য নারীটি নিজের থেকেই তার কাছে ধরা দিল।

হেসে হেসে বিকাশ বলে, 'এসো এসো।' বলতে বলতেই অদিতির পেছনে চাঁপাকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে এক ফুঁয়ে আলো নিভিয়ে দেবার মতো তার মুখ কালো হয়ে যায়। এক মুহূর্ত আগেও চাঁপার কথা ভাবেনি বিকাশ। চাঁপা মানেই জটিল কিছু সমস্যা। নিরুচ্ছ্বাস গলায় এবার বলে, 'এ কি, চাঁপাকেও নিয়ে এসেছ!'

চাঁপা যে এখানে কতটা অবাঞ্ছিত, পলকে টের পেয়ে যায় অদিতি। সে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে বলে, 'ওর জন্যেই আজ বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম। এখন বল ভেতরে ঢুকব কি ঢুকব না?'

বিকাশ লজ্জা পেয়ে যায়। শশব্যস্তে অদিতির হাত থেকে সুটকেশটা নিয়ে বলে, 'কী আশ্চর্য, এসো। প্লীজ—'

ভেতরে যেতেই অদিতি দেখতে পায় বসবার ঘরে খানতিনেক চেয়ার পাতা রয়েছে, সামনে চমৎকার একখানা সেন্টার টেবল। এগুলো সে আশা করেনি। চেয়ার দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'পেলে কোথায়?'

'তুমি আসবে বলে পাশের ফ্ল্যাট থেকে চেয়ে এনেছি। কিন্তু—'

'বল—'

'তুমি তখন বললে বাড়ি থেকে একেবারে চলে এসেছ। এখানে খাট, বিছানা, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা, কিছুই নেই। মানে সবে তো পজেসান পেলাম। এত তাড়াতাড়ি কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারিনি।'

'ওসব কোনো প্রবলেম না। ফার্নিচার থেকে বাসনকোসন, হায়ার পারচেজের দোকানে সব ভাড়ায় পাওয়া যায়।'

একটু ভেবে বিকাশ বলে, 'হঠাৎ এভাবে চলে এলে! আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

উত্তর না দিয়ে অদিতি চাঁপাকে অন্য একটা ঘরে রেখে ফিরে আসে। বলে, 'এত হেস্টি ডিসিশান নিতে অবাক হয়ে গেছ—না?'

'তা তো হয়েছিই।'

এবার সব ঘটনা জানিয়ে অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'এ ছাড়া আমি আর কি করতে পারতাম বল?'

খানিকটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে বিকাশ। অদিতির একখানা হাত তুলে নিয়ে গাঢ় গলায় বলে, 'তুমি তো জানো এই দিনটার জন্যে কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি। কিন্তু ওই চাঁপা—ও আমাদের লাইফে অনেক প্রবলেম নিয়ে আসবে। অকারণে অশান্তি, টেনশান, থানা-পুলিশ। ওর হ্যাজব্যান্ড লোকটা একটা জঘন্য ক্রিমিনাল। ওর জন্যে আমাদের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।' একটু থেমে ফের শুরু করে, 'তোমাকে পাচ্ছি। আমার লাইফে এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু নেই। কটা দিন একজন আরেক জনকে নিয়ে মেতে থাকব, এইরকম একটা পরিকল্পনা করে রেখেছি। কিন্তু সারাক্ষণ যদি একটা দুশ্চিন্তা মাথায় চেপে থাকে—' কথাটা আর শেষ করে না বিকাশ।

'আমার জন্যে ওকে মেনে নাও। প্লীজ বিকাশ—' অদিতি বিকাশের মুখের দিকে স্থির চোখে তাকায়।

দ্বিধান্বিতভাবে বিকাশ এবার বলে, 'ঠিক আছে।'

তার মুখ চেয়ে বিকাশ রাজী হয়েছে বটে, তবু অদিতির মনে হয় সবটাই বোধহয় ঠিক নেই। অদৃশ্য একটা কাঁটা থেকেই যাচ্ছে। অবশ্য বিকাশের দিকটাও ভেবে দেখা দরকার। নারী সচেতনতা, নারীর মর্যাদা রক্ষা—এইসব জরুরি ব্যাপার তো আছেই। কিন্তু যে পুরুষ নতুন বিয়ে করবে সে কখনই চাইবে না স্ত্রীর সঙ্গে একটি বিপজ্জনক এবং স্থায়ী সমস্যা এসে হাজির হোক।

বিকাশ এবার বলে, 'চল, আগে ফ্ল্যাটটা তোমাকে দেখাই। তারপর খাওয়া আর বিছানাপত্তরের ব্যবস্থা করা যাবে।'

মোট তিনটে বেডরুম, একটা বড় হল, দুটো বাথরুম, কিচেন, ব্যালকনি, দেওয়ালে এবং সীলিংয়ে টাটকা পেইন্টের গন্ধ, মোজেক করা ঝকঝকে ফ্লোর—সব মিলিয়ে ফ্ল্যাটটা চমৎকার। রাস্তার আলোয় বোঝা যাচ্ছে চারপাশে প্রচুর গাছপালা। পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা এখানে খুবই কম। কলকাতা শহরের এক কোণে এরকম ধুলোবালি ও আবর্জনামুক্ত পরিচ্ছন্ন একটি টাউনশিপ তৈরি করা হয়েছে তা যেন ভাবাই যায় না। ঘন শ্যামলিমা দিয়ে ঘেরা যেন একটা মনোরম দ্বীপ।

দেখা হয়ে গেলে বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'কি, পছন্দ হয়েছে?'

এমন সুন্দর পরিবেশে নতুন ঝকঝকে ফ্ল্যাটটা কারো অপছন্দ হতে পারে? অদিতি ঘাড় হেলিয়ে দেয়, 'হ্যাঁ।'

'এবার বাজারে যাওয়া যাক।'

'কাছাকাছি হায়ার-পারচেজের দোকান আছে?'

'তা তো জানি না। তবে মনে হচ্ছে, বাজারের গায়ে একটা ডেকরেটের দোকান দেখেছি।'

'দু-চার দিনের জন্যে ওখান থেকে বিছানা-টিছানার ব্যবস্থা করা যাবে মনে হয়।'

'তা যাবে।'

চাঁপাকে ফ্ল্যাটে রেখে অদিতি এবং বিকাশ বাজারে চলে যায়। ডেকরেটরকে বিছানা-টিছানা পাঠাতে বলে কিছু স্টেনলেস স্টীলের বাসন এবং কাপ-প্লেট কেনে। তাছাড়া কেরোসিন স্টোভ, দশ লিটার কেরোসিন, চাল, ডাল, চিনি, জেলি, মাখন, চা, দুধের টিন, বিস্কুট, পাউরুটি, কিছু আনাজ, মশলা, বাদাম তেল, ইত্যাদি কিনে ফিরে আসে।

আপাতত জোড়াতালি দেওয়া অস্থায়ী সংসার পাতা যাক। পরে ধীরেসুস্থে সব গুছিয়ে নেওয়া যাবে।

ফিরেই স্টোভ ধরিয়ে চা করতে বসে যায় অদিতি। সেই কখন নাকেমুখে গুঁজে কলেজে ছুটেছিল। বাড়ি ফেরার পর ক্রমাগত এমন সব নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেছে যে নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাওয়া যায়নি।

এতক্ষণের দম বন্ধ করা নাটকের পর টান-টান স্নায়ুগুলো এখন আলগা হয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে এক কাপ চা না পেলে মাথা ছিঁড়ে পড়বে। তাছাড়া খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড।

ক্ষিপ্র হাতে তিনজনের মতো চা এবং টোস্ট করে নেয় অদিতি। তার আর বিকাশের চায়ের কাপ-টাপ নিয়ে সে চলে আসে বাইরের ঘরে। চাঁপা কিচেনে বসে খাবে।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে হেসে ফেলে বিকাশ। বলে, 'এমন ড্রামাটিক্যালি

কেউ সংসার শুরু করেছে কিনা, আমার অন্তত জানা নেই।'

হাল্কা শব্দ করে অদিতিও হাসে, 'না।'

'ওয়ার্ল্ডের সেরা নাট্যকারও এমন সিচুয়েসনের কথা ভাবতে পারবে না। চার ঘণ্টা আগেও জানতাম না আমাদের নতুন লাইফ শুরু হতে চলেছে।'

'হুঁ।'

'আমার কিরকম ফীলিং যে হচ্ছে বলে বোঝাতে পারব না। কী মনে হচ্ছে জানো ?'

'কী ?'

'আমি যেন টপ অফ দা ওয়ার্ল্ডে চলে এসেছি।'

'তাই বুঝি ?'

'একজাক্টলি।'

এলোমেলো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বিকাশ বলে, 'তুমি এসেছ, মোস্ট ওয়েলকাম। কিন্তু একসঙ্গে জীবন শুরু করার আগে একটা খুব ইমপর্টান্ট ফরম্যাল ব্যাপার রয়েছে। সেটা সেরে নেওয়া দরকার।'

'বিয়ের কথা বলছ ?' অদিতি জিজ্ঞেস করে।

বিকাশ বলে 'হ্যাঁ। মানে সামাজিক রেকগনিসনের কথাটাও তো ভাবতে হয়।'

অদিতি হাসে, 'লোকনিন্দার ভয় তোমার তাহলে আছে !'

বিকাশ বিব্রতভাবে বলে, 'মানুষের মধ্যে থাকতে হলে কিছু কিছু প্রথা তো মানতেই হয়, যখন বিয়ের সাবস্টিটিউট আমরা ভেবে উঠতে পারিনি এখনও। তোমার সিঁথিতে সিঁদুর-টিঁদুর না দেখলে চারপাশের লোক আজেবাজে কমেন্ট করবে—'

'তোমার কি ধারণা, বিয়ের পর আমি সিঁদুর পরব ? ওটা বুঝি সাধ্বী স্ত্রীর সার্টিফিকেট ?'

'তা বলছি না। ওটা বহুকালের সিস্টেম। তাহলে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে নোটিশ দিই ?'

'ওসব পরে ভাবা যাবে। সিঁদুর, রেজিস্ট্রি ম্যারেজ, এ নিয়ে এখন মাথা খারাপ করার দরকার নেই। সারাদিন চাঁপা আর আমার ওপর দিয়ে যা গেছে তাতে আমাদের রেস্ট দরকার।'

বিকাশ সঙ্কোচ বোধ করে। বলে, 'সরি।' একটু থেমে আবার শুরু করে, 'একটা কথা ভেবে দেখলাম।'

'বল।'

'যতদিন না আমাদের বিয়েটা হচ্ছে, আমি ভবানীপুরের বাড়িতে থেকে

যাব। তোমরা এখানে থাকবে।'

'তুমি এখানে থাকলে আমার আপত্তি নেই। অবশ্য যদি বাড়িতে থাকাটা খুব জরুরি হয়, আলাদা কথা।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর অদিতি ফের বলে, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার বদনামের কথা ভাবছ?'

বিকাশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বলে, 'হ্যাঁ, মানে—'

'ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। তোমার আর আমার মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বড় ব্যাপার। বিয়েটা তো হাতেই রইল। এক সময় ওটা করে ফেললেই হবে। তার চেয়ে এখন বড় ব্যাপার হল, চাঁপার জন্যে এমন কিছু করে দেওয়া যাতে অন্যের ওপর নির্ভর না করে, নিজের সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।'

'হুঁ।' অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ে বিকাশ।

'আমাদের কলেজে ওর একটা কাজের চেষ্টা করব। তুমিও তোমাদের অফিসে দেখ না, যদি ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী হিসেবে ওকে ঢোকানো যায়।'

'আমাদের ওখানে ইউনিয়ন ভীষণ স্ট্রং। এমপ্লয়ীদের ছেলেমেয়ে ছাড়া বাইরের কাউকে ঢুকতে দেয় না।'

'ওর কেসটা একটু বুঝিয়ে বলো। সব শুনলে নিশ্চয়ই ইউনিয়নের লীডাররা ওর সম্বন্ধে সিমপ্যাথেটিক হবে।'

'বলে দেখব।'

'তোমার বন্ধুবান্ধবকেও বলে রেখো। সবাই মিলে চেষ্টা করলে একটা কিছু নিশ্চয়ই জুটে যাবে।'

বিকাশ বলে, 'বলব, বলব, বলব। চাঁপার ব্যাপারে তোমার যত চিন্তা আমার সম্বন্ধে তার কানাকড়িও না। এই অধমের দিকে একটু তাকাও।' বলে নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে দেখায়।

অদিতি লজ্জা পেয়ে যায়। সত্যিই তো, আসার পর থেকে চাঁপার কথাই সাত কাহন করে বলে যাচ্ছে। কিন্তু বিকাশের প্রতিও তো তার কিছু কর্তব্য আছে। বিকাশের একটা হাত নিজের দুই করতলে তুলে নিয়ে গভীর গলায় বলে, 'সারাক্ষণই তো তোমার দিকে তাকিয়ে আছি। সেটা কি বুঝতে পার না?'

সামান্য একটি কথায় এবং হাতের স্পর্শে একেবারে গলে যায় বিকাশ। অদিতিকে কাছে টেনে তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চোখ বোজে।

বার

দেখতে দেখতে দশটা দিন কেটে যায়।

গলফ গ্রীনে আসার পরদিন সকালেই অদিতি লালবাজারে সৈকতকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল, সে এখন থেকে এখানেই থাকবে। যদি জরুরি কোনো খবর থাকে তার কলেজে যেন ফোন করে সৈকত। নইলে গলফ গ্রীনে লোক পাঠিয়ে যোগাযোগ করতে হবে।

সৈকত সেদিন একটা দরকারী খবর দেয়। নগেনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তবে তাকে বেশিদিন আটকে রাখা যাবে না। কেননা লোকটার পেছনে সত্যিই একজন পাওয়ারফুল রাজনৈতিক দাদা রয়েছেন। নগেন তাঁর জন্য জান দিয়ে ইলেকসানের সময় খাটে। কাজেই দাদাটি তাঁর প্রভাব খাটিয়ে যেন তেন প্রকারে নগেনকে পুলিশের কব্জা থেকে বার করে আনবেনই। তবে অদিতি বা চাঁপার ভয় নেই। সে যাতে বড় রকমের গোলমাল বাধাতে না পারে, ব্যক্তিগতভাবে সেদিকে নজর রাখবে সৈকত। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দাদাটির সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন নগেনকে অদিতির ব্যাপারে প্রশ্রয় দেবেন না। গলফ গ্রীনে যাতে সে না যায়, সেটা দেখবেন।

তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অদিতি ভেবেছে, লালবাজারে তার জানাশোনা না থাকলে নগেন যে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলত, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

এই দশ দিনে নানা ঘটনা ঘটে গেছে।

এর মধ্যে একদিন বালিগঞ্জে নিজস্ব জিনিসপত্র আনতে গিয়েছিল অদিতি। হেমলতা সেদিন তার দুই হাত নিজের বুকের ভেতর টেনে নিয়ে ব্যাকুলভাবে বলেছিলেন, 'তুই কোথায় আছিস বুবু—আমাকে বলতে হবে।'

মায়ের কণ্ঠ দুর্ভাবনা এবং ব্যাকুলতা যে কতটা আন্তরিক তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি অদিতির। সে বলেছে, 'তোমাকে তো বলতেই হবে মা, কিন্তু পরে।' গাঢ় গভীর আবেগে তার গলা বুজে এসেছিল।

'পরে না, এখনই বল।'

একটু ভেবে অদিতি মুখ নামিয়ে বলেছে, 'গলফ গ্রীনে বিকাশের ফ্ল্যাটে।'

হেমলতা স্থির চোখে অদিতিকে লক্ষ করতে করতে জিজ্ঞেস করেছেন, 'তোদের বিয়ে হয়ে গেছে?'

'না মা।'

'বিকাশ কী বলছে?'

মা কী বলতে চান বুঝতে না পেরে অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'কোন ব্যাপারে ?'

হেমলতাকে সামান্য অসহিষ্ণু দেখিয়েছে, তিনি বলেছেন, 'কোন ব্যাপারে আবার ! আমি বিয়ের কথা বলছি ।'

অদিতি বলেছে, 'বিকাশ বিয়েটা চুকিয়ে ফেলতে চাইছে ।'

হেমলতার দুর্ভাবনা যেন কেটে গেছে, তিনি বলেছেন, 'যত তাড়াতাড়ি পার, ওটা চুকিয়ে ফেল ।'

যে কথাগুলো বিকাশকে অসঙ্কোচে বলতে পেরেছিল অদিতি, মাকে তা বলা যায়নি। সে বলেছে, 'এত তাড়া কী মা ? যাক না আর কিছুদিন ।'

হেমলতা বলেছেন, 'লোকসমাজে বাস করতে হলে ওটা দরকার বুবু। মানুষকে বাদ দিয়ে তো কেউ বাঁচতে পারে না। তাদের পছন্দ-অপছন্দ আর মতামতকে উপেক্ষা করলে কি চলে ? বিয়েটা কিন্তু করে ফেলবে ।'

চিরকালের দুর্বল শঙ্কিত মায়ের ভেতর থেকে অন্য এক মা বেরিয়ে এসেছিল যেন। তাঁর আচরণে কথাবার্তায় এতটুকু ভীরুতা নেই। যা রয়েছে তা হল কর্তৃত্ব এবং দৃঢ়তা। অদিতি বলেছে, 'ঠিক আছে। তোমাকে একদিন গলফ গ্রীনে নিয়ে যাব ।'

'আগে তোদের বিয়ে হোক, তার আগে নয় ।'

একটু চুপচাপ।

তারপর হেমলতা এবার বলেছেন, 'আমার একটা ইচ্ছে আছে বুবু—'

অদিতি জিজ্ঞেস করেছে, 'কী ?'

'বিয়ের দিনটা ঠিক হলে আমাকে খবর দিবি। তখন—' বলতে বলতে থেমে গেছেন হেমলতা।

চারপাশ ভাল করে দেখে নিয়ে মৃদু কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে দিয়েছেন হেমলতা, 'তোর জন্যে কিছু গয়না আছে। তোকে—'

মাকে থামিয়ে দিয়ে অদিতি বলেছে, 'আমার গয়না-টয়নার দরকার নেই। তা ছাড়া যে বাড়িতে আমার কোন সম্মান নেই সেখানকার কিছু নেবো না। গয়না ছাড়াই আমার বিয়ে হবে ।'

হেমলতা বলেছেন, এ সব গয়না এ বাড়ির নয়, আমার নিজস্ব। আমার বিয়ের সময় বাবা আমাকে দিয়েছিলেন। এগুলো নিলে তোমার মর্যাদা নষ্ট হবে না ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছে অদিতি। পরে বলেছে, 'তুমি তো আমাকে তোমার সবকিছু দিয়ে দিতে চাইছ। তারপর ?'

'তারপর কী ?'

'তোমার ওইটুকুই সম্বল। হাতছাড়া হয়ে গেলে—' বলতে বলতে থেমে গেছে অদিতি।

মেয়ের অনুচ্চারিত কথার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি হেমলতার। তিনি বলেছেন, 'হাতছাড়া আবার কী। তোকে কি আমি কিছু দিতে পারি না বুবু?' তাঁকে ভারি বিষণ্ণ আর দুঃখিত মনে হয়েছিল।

মায়ের কথার উত্তর না দিয়ে অদিতি বলেছে, 'মা, আমি যতদূর জানি, বিয়ের পর এ বাড়ি থেকে তুমি কিছুই পাওনি। বাবা আর দাদাদের অবস্থা আমি জানি। ওদের কে দেখে তার ঠিক নেই। কোনো একটা বিপদ-আপদ ঘটে গেলে তোমার ভবিষ্যৎ কী হবে? কে দেখবে তোমাকে?'

হেমলতা স্নিগ্ধ গলায় এবার বলেছেন, 'আর কেউ না দেখুক, তুই দেখবি।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর অদিতি বলেছে, 'একটা কথা বলি। ঠিক উত্তর দেবে কিন্তু—'

হেমলতা উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী কথা রে?'

সোজা মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে অদিতি বলেছে, 'বাবা আর ছোটদা বড়দা আমি চলে যাবার পর গয়নাগুলো কি চেয়েছিল?'

হেমলতা চমকে উঠেছেন, 'কে বললে তোকে?'

'ওটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিসুদ্ধি আমার আছে।'

হেমলতা উত্তর দেননি।

অদিতি থামেনি, 'সিতাংশু নামের বদমাশ লোকটা আমাকে কব্জা করতে না পেরে নিশ্চয়ই বাবা আর ছোটদা বড়দার ওপর টাকার জন্যে প্রেসার দিচ্ছে। ওরা টাকা পাবে কোথায়? তোমার গয়নার ওপর এখন নিশ্চয়ই ওদের নজর পড়েছে।'

হেমলতা এবারও চুপ করে থেকেছেন।

অদিতি বলেছে, 'মা, ভেবেছিলাম, তোমার গয়না নেবো না। কিন্তু এখন ঠিক করে ফেললাম ওগুলো বাঁচাবার জন্যেই নিতে হবে। আমি একটা লকারের ব্যবস্থা করে দু-চারদিনের ভেতর এসে নিয়ে যাব।' একটু ভেবে বলেছে, 'এর ভেতর ওরা যতই চাপ দিক, গয়না কিন্তু দিও না।'

রমাপ্রসাদ বরুণ মীরা এবং বন্দনার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। তারা কেউ অদিতির সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। শুধু প্রবল আক্রোশে তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

হাসপাতাল থেকে মৃগাঙ্ককে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছিল। অদিতি তার ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন কেমন আছ ছোটদা?'

মৃগাঙ্ক খাটে শুয়ে ছিল। উত্তর না দিয়ে দেওয়ালের দিকে পাশ

ফিরেছে। আর মীরা কর্কশ গলায় বলেছে, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর আহ্লাদের দরকার নেই।'

হেমলতাকে বাদ দিলে আর যিনি সেদিন সস্নেহ এবং স্বাভাবিক ব্যবহার করেছেন তিনি মৃণালিনী।

মৃণালিনী কাছে বসিয়ে পিঠে এবং মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বিকাশের ফ্ল্যাটটা কোথায়, সেখানে আর কে কে থাকে ইত্যাদি নানা খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হ্যাঁ রে, বিকাশ ছেলেটা কেমন?'

অদিতি বলেছে, 'এখন পর্যন্ত ভালই মনে হচ্ছে। পরে কী মূর্তি ধারণ করবে জানি না।' ইচ্ছা করেই চাঁপা সম্পর্কে বিকাশের আপত্তির কথাটা আর জানায়নি।

'বিয়ে হয়ে গেছে তোদের?'

'না।'

'সব দিক বুঝে বিয়ে করবি। পরে যেন আপসোস করতে না হয়।'

জীবন সম্পর্কে মৃণালিনীর ধ্যানধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অন্য মেয়েদের চেয়ে একেবারে আলাদা। বিয়ের পর প্রচণ্ড ধাক্কায় তিনি আমূল বদলে গেছেন। যে সমাজে পুরুষের অবাধ প্রভুত্ব সেটা তিনি ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন। পৃথিবীর কোনো পুরুষকেই তিনি শতকরা একশ ভাগ বিশ্বাস করেন না। এ বাড়িতে অদিতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সবচেয়ে গভীর। তিনি চান অদিতি কাউকে যেন বোকার মতো বিশ্বাস না করে বসে। বিয়ে করাটা অন্যায় বা নিষিদ্ধ ব্যাপার নয়। পৃথিবীতে পুরুষদের অভিসন্ধির কথা ভেবে সব মেয়ে কুমারী হয়ে থাকবে, তা ভাবা যায় না। কিন্তু তিনি চান তাঁর সাহসী তেজস্বিনী ভাইঝিটি বিকাশকে বিয়ের আগে ভাল করে যাচাই করে নিক। পরে যেন আপসোস করতে না হয়।

মৃণালিনীর মনোভাবটা বোঝে অদিতি। সে হেসে বলেছে, 'কিন্তু মা তো এক্ষুনি বিয়েটা সেরে ফেলার জন্যে চাপ দিচ্ছে। নইলে নাকি ভীষণ দুর্নাম রটে যাবে।'

মৃণালিনীকে এবার অসহিষ্ণু দেখিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'না না, বৌদির কথা মোটে শুনবি না। আমাদের সময় মেয়েদের সুনাম আর সতীত্বের মানে একরকম ছিল। ও দুটোর জোরেই তাদের বিয়ের বাজারে বিকোতে হত। কিন্তু তুই একালের মেয়ে, সুন্দরী, সবচেয়ে বড় কথা চাকরি-বাকরি করিস। তোকে বিয়ে করার জন্যে কত ছেলে হাঁ করে আছে। কিছুদিন মেলামেশা করে দ্যাখ, বিকাশ ছেলেটা কেমন। যদি মনে হয় খাঁটি, বিয়ে করবি। নইলে কোনোমতেই না।'

'তুমি একজন রিবেল পিসি।'

'তাতে আমার কোনো সঙ্কোচের কারণ নেই। জানবি ওটাই আমার আসল পরিচয়। তবে একটা কথা।'

'ইমোসানের মোমেন্টে নিজেকে ভেসে যেতে দিও না। তাতে তোমার দাম কমে যাবে। আমি কি বলছি, আশা করি বুঝতে পারছ।'

'পারছি।'

মৃণালিনী বলেছেন, 'একজন যুবক আর একটি যুবতী কাছাকাছি থাকলে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। দৈহিক শুচিতা বা অশুচিতা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, কিন্তু প্রতিটি মানুষেরই, বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে দেহ হচ্ছে অত্যন্ত দামী অ্যাসেট। সেটা একটা স্কাউন্ড্রেলের খাদ্য হতে দেওয়া উচিত না।'

অদিতি চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'বাড়ির অন্য সব খবর বল। সেই লোকটা মানে সিতাংশু ভৌমিক এখনও আসে?'

'রোজ। তবে আগের মতো হইচই আর হয় না। মনে হয়, কিছু একটা মতলব ওরা করছে। ঠিক বুঝতে পারছি না। দুর্গাকে অবশ্য লাগিয়ে রেখেছি, ঠিক জেনে যাব। আমার কী মনে হয় জানিস বুবু?'

'কী?'

'তোর বাবা আর তোর দুই অকালকুষ্মাণ্ড দাদা যে টাকাটা ধার নিয়েছিল তার জন্যে এই শয়তানটা এবার চাপ দেবে।'

এই বিষয়টা নিয়ে খানিক আগেই যে তার কথা হয়ে গেছে সেটা আর জানায়নি অদিতি। ঠিক করেছে, তেমন দরকার হলে পরে কথা বলবে। সে শুধু বলেছে, 'আমারও সেইরকম ধারণা।'

একটু চিন্তা করে অদিতি পরে বলেছে, 'আমি চলে যাবার পর সবাই তোমার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছে?'

মৃণালিনী হেসেছেন, 'আগের চেয়ে খারাপ কিছু না। তোর মাকে বাদ দিলে সকলেই আমার মৃত্যু চায় কিন্তু অত সহজে আমি মরছি না।'

অদিতি বলেছে, 'আমি ঠিকানা লিখে কটা পোস্টকার্ড নিয়ে এসেছি। তেমন দরকার হলে চিঠি লিখে দুর্গাকে দিয়ে পোস্ট করিয়ে দিও।'

'আচ্ছা।' একদিন তোদের ফ্ল্যাটে আমাকে নিয়ে যাস।'

'নিশ্চয়ই।'

এর ভেতর একদিন টোকনের ফ্যাক্টরিতেও চলে গিয়েছিল অদিতি। তাকে দেখে প্রথমটা একেবারে হাঁ হয়ে গেছে টোকন। কেননা তার এই জেঠতুতো বোনটি আগে আর কখনও আসেনি।

বিস্ময় খানিক থিতিয়ে এলে একেবারে হুল্লোড় বাধিয়ে দিয়েছিল টোকন, ছোটদি, তুই ! এ তো আমি ভাবতেই পারিনি।'

অদিতি বলছে, 'তোর সঙ্গে খুব আর্জেন্ট কথা আছে, তাই চলে এলাম।'

'কথা পরে হবে, আগে বল কী খাবি ?'

অদিতি গিয়েছিল চারটে নাগাদ। দুপুরে খেয়েছিল এগারটায়, খিদেও পেয়েছিল প্রচণ্ড। টোকনের কাছে তার এতটুকু সঙ্কোচ নেই। সে হেসে বলেছে, 'কী আর খাব ! চা আর যা হোক কিছু আনা।'

টোকন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'যা হোক কিছুতে হবে না। দেখে মনে হচ্ছে তোর পেটের ভেতর টেরিফিক আগুন জ্বলছে। দাঁড়া ব্যবস্থা করছি।' একটা বেয়ারাকে ডেকে ক্যানটীন থেকে কাটলেট, ফিশ ফ্রাই, টোস্ট, চা ইত্যাদি আনিয়ে বলেছে, 'খা।'

'এত কে খাবে ?'

'আরে বাবা স্টার্ট করে দে না। যেটুকু পড়ে থাকবে এই গোডাউনে ঢুকিয়ে দেবো—' বলে আঙুল দিয়ে নিজের পেটটা দেখিয়েছে টোকন।

'নে তুইও হাত লাগা—'

'ও. কে মেমসাহেব।'

খেতে খেতে অদিতি বলেছে, 'আমার কথা কিছু শুনেছিস ?'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে ভেতরে ভেতরে চকিত হয়ে উঠেছে টোকন। বলেছে, 'না।'

'তুই অনেকদিন আমাদের বাড়ি যাসনি, তাই জানিস না। অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে এর ভেতর।' বলে মুখ নামিয়ে কাঁটা দিয়ে একটা কাটলেট গেঁথে ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করতে শুরু করেছিল অদিতি।

জোরে শ্বাস টেনে টোকন ঈষৎ চাপা গলায় বলেছে, 'কী হয়েছে রে ছোটদি ?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়নি অদিতি। বেশ কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলেছে, 'আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি।'

টোকন একেবারে হকচকিয়ে গেছে, বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করেছে, 'কোথায় গেছিস ? আর কেনই বা বাড়ি ছাড়লি ?'

ধীরে ধীরে সব জানিয়ে দিয়েছে অদিতি। তারপর বলেছে, 'এ ছাড়া আমার আর কী করার ছিল বল !'

'তুই ঠিকই করেছিস ছোটদি। কিন্তু—'

'বল—'

'বিকাশ নামের ওই ভদ্রলোকটির ওপর ডিপেন্ড করা যায় তো ?'

'আমি তো তেমনই মনে করছি। অবশ্য মানুষের নেচারের ভেতর দোষ-গুণ দুইই থাকে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত।'

'চাঁপার ব্যাপারে পরে প্রবলেম হবে না ?'

'হু নোজ ?' অদিতি হেসেছে। যদিও সাময়িকভাবে তার কথায় চাঁপাকে মেনে নিয়েছে বিকাশ তবু একটা খিঁচ যে থেকে গেছে সেটা তার চেয়ে কে বেশি জানে ! চাঁপার সম্বন্ধে এত জনের সঙ্গে এত কথা হয়েছে যে আর কোনো আলোচনা করতে ইচ্ছা করছে না। অদিতি বলেছে, 'পরে সত্যিই যদি প্রবলেম হয় তখন দেখা যাবে।'

টোকন উত্তর দেয়নি।

অদিতি ফের বলেছে, 'আমি তো বাড়ি ছেড়েছি। মনে হচ্ছে ওখানে অনেক ট্রাবল আসছে। তুই কিন্তু দু-একদিন পর পর মাকে আর পিসিকে দেখে আসবি। তেমন বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দিবি।'

'আচ্ছা।'

একটু চুপচাপ।

তারপর টোকন সামান্য মজার গলায় বলেছে, 'তুই দেখালি বটে ছোটদি।'

অদিতি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছে, 'কিরকম ?'

'আমাদের বংশে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহিনী হল পিসি। তুই তাকেও ছাড়িয়ে গেলি।'

'আমি পিসির চল্লিশ বছর পর পৃথিবীতে এসেছি। পিসির থেকে খানিকটা যদি না এগিয়ে যেতে পারলাম তো নেক্সট জেনারেশনে জন্মানোটাই মীনিংলেস।'

'রাইট।'

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অদিতি বলেছে, 'এবার চলি রে টোকন।' বলতে বলতে উঠে পড়েছে সে।

'ঠিক আছে।' টোকনও উঠে দাঁড়িয়েছে, 'চল, তোকে বাস-এ তুলে দিয়ে আসি।'

বাস স্ট্যান্ডে এসে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি, একটা স্পেশাল বাস পেয়ে গেছে অদিতি।

এর মধ্যে নিয়মিত কলেজে গেছে অদিতি। রোজ চারটে কি পাঁচটা করে ক্লাশ নিয়েছে। কলেজ থেকে গেছে 'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে। সে যে বাড়ি ছেড়ে চাঁপাকে নিয়ে বিকাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছে তা এখানকার মেম্বাররা জেনে ফেলেছে। আসলে অদিতিই তাদের জানিয়ে দিয়েছে। তার স্বভাবে লুকোচুরি ব্যাপারটা নেই। তা ছাড়া সে কিছু অন্যায় করেনি।

তার ধারণা চাঁপার জন্য যা করেছে তা না করলে নিজের কাছেই তার মাথা নীচু হয়ে যেত।

সব শুনে 'নারী-জাগরণ'-এর মেম্বাররা প্রথমটা হকচকিয়ে গেছে। পরে বেশির ভাগই তার সাহস এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের জন্য অদিতিকে অভিনন্দন জানিয়েছে। অকপটেই বলেছে, 'তুমি যা করলে সেটা আমরা পারতাম না।'

সামনা সামনি না হলেও আড়ালে কেউ কেউ মন্তব্য করেছে. এটা বাড়াবাড়ি। ওর মধ্যে শো-অফ করার ব্যাপার আছে। দেখাতে চায় যেন কত বিরাট একজন সোসাল ওয়ার্কার।'

মেম্বাররা আরো যা বলেছে তা এইরকম। বিকাশের সঙ্গে বিয়ের সময় তাঁদের যেন ফাঁকি দেওয়া না হয়. নেমন্তন্ন না করলে গলফ গ্রীনে গিয়ে তারা সত্যাগ্রহ করবে ইত্যাদি।

অমিতাদি তাঁর চেম্বারে অদিতিকে ডেকে নিয়ে গভীর গলায় বলেছেন, 'তুমি একটা অচেনা মেয়ের জন্যে যে স্যাক্রিফাইস করলে তার তুলনা হয় না। তোমার সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল অদিতি।'

বিব্রত মুখে অদিতি বলেছে, 'এভাবে বলবেন না অমিতাদি। সামান্য একটা ব্যাপারের জন্যে এত প্রশংসা আমার প্রাপ্য নয়।'

'সামান্য কি অসামান্য সেটা আমি বুঝি। সে যাক, তোমার পেছনে আমাদের দাঁড়ানো উচিত ছিল। 'নারী-জাগরণ'-এর দিক থেকে বিরাট ত্রুটি হয়ে গেছে। যদি কিছু দরকার হয় বলো। এখন থেকে আমরা তোমার পেছনে আছি।'

অমিতাদির এই পরিবর্তনটা ভাল লেগেছে অদিতির। দুদিন আগেও গা বাঁচিয়ে চলতে চেয়েছিলেন তিনি। 'নারী জাগরণ'ও চাঁপার মতো একটা উটকো ঝঞ্ঝাটকে দূরে সরিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু অদিতি একক-ভাবে চাঁপার ব্যাপারে যে সাহস এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টান্ত চোখের সামনে তুলে ধরেছে তাতে তারা সবাই হয়ত ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েছে। অমিতাদিরা বুঝতে পেরেছেন, শুধু মাত্র মিটিং মিছিল আর সেমিনার করে, গরম গরম শ্লোগান দিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা যায় না। তার জন্য অনেক বেশি ইনভলভমেন্ট দরকার। সমস্যার বাইরের স্তরে আলগাছে ভেসে থাকলে কাজের কাজ কিছুতেই হবে না।

অদিতি আন্তরিক সুরে বলেছে, 'আপনারা পাশে থাকবেন, আমার সাহস অনেক বেড়ে গেল অমিতাদি।'

অমিতাদি বলেছেন, 'তোমার যখন যা দরকার হয় বলবে।'

'নিশ্চয়ই বলব।'

এদিকে বিকাশ গলফ গ্রীনেই থাকতে শুরু করেছে। গোড়ায় ঠিক হয়েছিল, যতদিন বিয়েটা না হচ্ছে সে তাদের ভবানীপুরের বাড়িতে থাকবে কিন্তু কী ভেবে শেষ পর্যন্ত গলফ গ্রীনেই চলে এসেছে।

ছায়ার পারচেজের দোকান থেকে খাট আলমারি সোফা চেয়ার টেবল ইত্যাদি ভাড়া করে এনে এর মধ্যে ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে নিয়েছে অদিতিরা। মোট তিন বেডরুমের একটা ঘরে বিকাশ থাকে, একটায় চাঁপা, আরেকটায় অদিতি। এখনও ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে নোটিশ দেওয়া হয়নি। তবে রোজই বিকাশ তাকে কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছে। অদিতি এ-ব্যাপারে মনে মনে তৈরিও হয়ে নিয়েছে। সে ঠিকই করে ফেলেছে, দু-চারদিনের ভেতর বিয়ের বাবস্থা করে আসবে। মনের জোর যতই থাক, যতই আলাদা ঘরে রাত কাটাক, খানিকটা অস্বস্তি হচ্ছেই। রক্তের ভেতর ধারাবাহিক সংস্কার তো কিছুটা থেকে যায়ই।

অদিতি অকারণে যেচে কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীতে গায়ে পড়া মানুষের অভাব নেই। চারপাশের ফ্ল্যাটের মহিলারা নিজের থেকেই আলাপ করতে আসে। তাদের কৌতূহলের শেষ নেই। কতদিন বিয়ে হয়েছে, এর আগে কোথায় ছিল, স্বামী কী করেন, ইত্যাকার নানা প্রশ্নের সামনে ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে অদিতি। ভাসা ভাসা উত্তর দিয়ে কোনোরকমে এড়াতে চায় সে।

অদিতি দূরে থাকতে চাইলে কী হবে, পরোপকারীর সংখ্যা যে কত তার হিসেব নেই। কে বলে কলকাতা উদাসীন শহর? আশেপাশের গৃহিণীরা কখনও এককভাবে কখনও দলবদ্ধ হয়ে হানা দেয়। চাঁপাকে সবাই রান্নাবান্না, ঘরের কাজ করতে দেখে। চাঁপা ছাড়া আর কোনো লোকের দরকার আছে কিনা জানতে চায়। অদিতি বিব্রত মুখে জানায়, চাঁপা তাদের কাজের লোক নয়, আত্মীয় হয়। তারা নিজেরা নিজের কাজ করে নিতে পারবে, অন্য লোকের প্রয়োজন নেই।

এবার প্রতিবেশিনীরা জানতে চান, রান্নার গ্যাসের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, সরকারি দুধের জন্য অদিতিরা কার্ডের দরখাস্ত করেছে কিনা, ইত্যাদি। যদি না করে থাকে তারা সাহায্য করবে। অদিতি সবিনয়ে জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত কারো সহায়তার দরকার নেই। তেমন বুঝলে বলবে।

একদিন বিকেলে মজার একটা ব্যাপার ঘটেছিল। মজার এবং অস্বস্তিরও। একজন গোলগাল চেহারার বয়স্কা মহিলা—ষাটের ওপরে বয়স, এখনও টকটকে গায়ের রং, চুল সবটাই প্রায় সাদা, পরনে নকশাপাড় ধবধবে সাদা খোলের শাড়ি, কপালে পুরনো রুপোর টাকার সাইজের সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতেও ডগডগে সিঁদুর, হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি, গলায় হার,

নাকে হীরার নাকছাবি পানের রসে টুকটুকে ঠোঁট—এসে হাজির। একে আগে দেখেনি অদিতি। একটু অবাক হয়েই সে জিজ্ঞেস করেছে, 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।'

মহিলা বলেছেন, 'চিনবে কী করে? আমি তো আর আগে আসিনি। আমরা ওই ফ্ল্যাটটায় থাকি।' এখানে অসংখ্য চারতলা এবং পাঁচতলা বাড়ি। রাস্তার ওধারে, তিনটে ব্লকের পর চার নম্বর বাড়ির থার্ড ফ্লোরের কোণের দিকের শেষ ফ্ল্যাটটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছেন মহিলা।

অগত্যা ঘরে এনে তাঁকে বসাতে হয়েছে।

মহিলা বলেছেন, 'কদিন হল খবর পেয়েছি তোমরা এখানে নতুন এসেছ। আগে আসা উচিত ছিল কিন্তু আমার কর্তার আর্থ্রাইটিসের কষ্টটা এত বেড়ে গিয়েছিল যে ওঁকে ছেড়ে নড়তে পারছিলাম না।'

ভদ্রতার খাতিরে অদিতিকে বলতেই হয়েছে, 'এখন কেমন আছেন উনি?'

'অনেকটা ভাল। তা নতুন জায়গায় এসে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

অদিতি আভাস পেয়ে গেছে, আরেক জন পরোপকারীর আবির্ভাব ঘটেছে। সে কিছুটা বাস্তভাবেই বলেছে, 'না না, কোনো অসুবিধে নেই।'

মহিলা বলেছেন, 'মাসিমার কাছে লজ্জা করো না যেন।' বলে মধুর হেসেছেন।

'লজ্জা করব কেন? সত্যিই অসুবিধে হচ্ছে না।'

'বেশ। চল তোমার ফ্ল্যাট কেমন গুছোলে দেখি।'

খুবই বিরক্ত হচ্ছিল অদিতি। কিন্তু একজন মায়ের বয়সী মহিলাকে, যিনি আবার তাদের প্রতিবেশিনী, বার করে দেওয়া যায় না। নিরুপায় হয়েই গোটা ফ্ল্যাটটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁকে দেখাতে হয়েছে।

মহিলা জিজ্ঞেস করেছেন, 'ফার্নিচারগুলো তো ভারি সুন্দর। মনে হচ্ছে অনেক আগের তৈরি।'

এগুলো যে ভাড়া করে আনা হয়েছে তা আর বলেনি অদিতি। অস্পষ্ট-ভাবে সে এমন একটা উত্তর দিয়েছে যাতে কিছুই বোঝা যায় না।

ফ্ল্যাট দেখানোর পর অদিতিরা আবার ড্রইংরুমে ফিরে এসেছিল। মহিলা এবার প্রায় ক্রিমিনাল ল-ইয়ারদের মতো জেরাই শুরু করেছেন। বিকাশ এবং তার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব জেনে নিয়ে তাদের বাবা-মা-ভাই-বোনদের সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছেন। জানতে চেয়েছেন, তাদের বিয়েটা বাবা-মা-রাই দিয়েছেন না নিজেরাই পরস্পরকে পছন্দ করে করেছে। অদিতি সব কথার সঠিক উত্তর দেয়নি, কেননা তাতে এই ঝানু মহিলাটির প্রশ্নের তোড় আরো

বেড়ে যাবে। মুখে যা এসেছে বানিয়ে বানিয়ে বলে গেছে অদিতি।

একসময় মহিলাটি বলেছেন, 'একটা কথা বলি মা, যদি কিছু মনে না করো—'

অদিতি যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। বলেছে, 'কী কথা ?'

'আমি আসার আগে এখানকার অনেকেই তোমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। তাদের কাছেই শুনলাম—' বলে থেমে যান মহিলা, স্থির চোখে অদিতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে করতে ফের শুরু করেন, 'হ্যাঁ ঠিকই তো বলেছিল ওরা।'

শঙ্কাটা কয়েক গুণ বেড়ে যায় অদিতির। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী বলছিল ?'

'তুমি সিঁদুর পরো না। শুনে আমার বিশ্বাস হয়নি, এখন দেখছি ওদের কথাই ঠিক।'

অদিতি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এমন গায়ে-পড়া উটকো মানুষ সে আগে কখনও দেখেনি। কেউ সিঁদুর পরল কি পরল না, এই নিয়ে কেউ যে মাথা ঘামাতে পারে, এ ভাবাই যায় না।

মহিলা মাথা নেড়ে নেড়ে ফের বলেছেন, 'এটা খুব অন্যায়। হিন্দু ঘরের সধবা মেয়েরা সিঁদুর পরবে না, এত আধুনিক হওয়া ভাল নয় গো মা। আমি এক কৌটো সিঁদুর এনেছি। আজ থেকে পরবে।'

অদিতির মতো ঝকঝকে সাহসী মেয়েও ভেতরে ভেতরে নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। সে বলতে পারেনি, এখনও তার আর বিকাশের বিয়ে হয়নি। অনাত্মীয় অবিবাহিত দুটি তরুণ তরুণী একসঙ্গে একই ফ্ল্যাটে রয়েছে, মানুষ তা ভাল চোখে দেখে না। সতীত্বের ধ্যানধারণা এখনও এক তিল পালটায়নি। তারা এক ফ্ল্যাটে থাকলেও ঘরে এক বিছানায় রাত কাটায় না, এ কথা কে বিশ্বাস করবে ?

লোকনিন্দাকে একটা সীমা পর্যন্ত গ্রাহ্য করে না অদিতি। কিন্তু সে আর বিকাশের সম্পর্কটা জানাজানি হয়ে গেলে এই মহিলারা যে গোটা পৃথিবী তোলপাড় করে ফেলবেন, সেটা ভেবে কুঁকড়ে গেছে সে। এখানে থাকাই তখন অসম্ভব হয়ে পড়বে। চাঁপার সমস্যা তো রয়েছেই, তার ওপর নতুন অশান্তি জুটিয়ে এনে সব কিছু আরো জটিল আরো অস্বস্তিকর করে তোলার মানে হয় না। কোনো কোনো সময় খানিকটা ডিপ্লোম্যাটিক হওয়া দরকার।

অদিতি বলেছে, 'সিঁদুর টিঁদুর আমরা ঠিক পছন্দ করি না।'

মহিলা প্রায় শিউরে উঠে বলেছেন, 'এসব অলক্ষুণে কথা বলো না। এতে স্বামীর অকল্যাণ হয়।'

এমন নাছোড়বান্দা মহিলার সংস্পর্শে আগে আর এসেছে কিনা, মনে পড়ে না অদিতির। সিঁদুরের মহিমা প্রচারের জন্যই যেন তাঁর জন্ম।

এয়োতীর চিহ্ন হিসেবে সিঁদুর পরাটা যে প্রতিটি বঙ্গনারীর পবিত্র কর্তব্য, এটা না পরলে যে মহাপাপ হয়, ইত্যাকার নানা সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে মহিলা চলে গেছেন। যাবার আগে আরো জানিয়েছেন, সিঁদুরটা অদিতি ব্যবহার করছে কিনা তা দেখার জন্য আবার আসবেন।

অদিতি ঠিকই করে ফেলেছে, এর পরও যদি সত্যি সত্যিই ঝঞ্ঝাট বাধাতে আসেন মহিলা, সে পরিষ্কার জানিয়ে দেবে, বিয়ের আগে সে আর বিকাশ একসঙ্গে আছে। এতে না হবার হবে।

এর ভেতর চাঁপা বার বার তাকে বলেছে, 'দিদি, আমার জন্যে আপনাকে কত হেনস্থা হতে হচ্ছে। আমি বরং চলে যাই।'

অদিতি চমকে উঠেছে, 'কোথায় যাবে তুমি? নগেনের কাছে?'

'না। ওখেনে গেলে মরণ।'

'তা হলে?'

'যেদিকে দু'চোখ যায়।'

অদিতি তার পিঠে হাত রেখে গভীর গলায় বলেছে, এ সব চিন্তা কক্ষনো মাথায় এনো না।'

চারিদিকের হাজারটা সমস্যার মধ্যেও নিজের কাজ ঠিকমতো করে গেছে অদিতি। দিনন্দিন রুটিনের এক চুল ব্যতিক্রম ঘটেনি। যেদিন যেমন তার ক্লাস ছিল—দশটায়, এগারোটায় কি একটায়—ভাত-টাত খেয়ে চলে গেছে কলেজে। ঘণ্টা তিন চারেক ক্লাস লেকচার দিয়ে সোজা 'নারী-জাগরণ'-এর অফিসে। সেখান থেকে বিকাশ, কৃষ্ণা, হৈমন্তী বা রমেনকে সঙ্গে করে ঢাকুরিয়ার বস্তিতে।

এই বস্তিতে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে আগেই অনেক কথা হয়েছে। অমিতাদিরা বাধা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁদের ভয় অদিতি ওখানে গেলে গোলমাল হবে, কিন্তু তাকে আটকানো যায়নি। যে কাজের দায়িত্ব সে নিয়েছে একটা ক্রিমিনালের ভয়ে তা মাঝপথে ছেড়ে দেবার মানে হয় না।

এদিকে সৈকত যা বলেছিল তা-ই ঘটেছে। অ্যারেস্ট করার পর নগেনকে দু'দিনের বেশি ধরে রাখা যায়নি। রাজনৈতিক দাদাটি তাকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন, তবে আগের মতো অতটা উগ্র বা মারমুখী নয় নগেন. দূর থেকে অদিতির উদ্দেশে রোজই কিছু খিস্তিখেউড় দিয়ে এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে সে উধাও হয়ে যায়।

'নারী-জাগরণ'-এর এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে চাঁপার জন্য একটা কাজের

চেষ্টাও চলছে। অমিতাদি থেকে শুরু করে প্রতিটি মেম্বারই এ ব্যাপারে চারিদিকে খোঁজখবর নিচ্ছে। আশা করা যায়, কিছু একটা খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে।

এর মধ্যে চমকপ্রদ একটা ব্যাপার ঘটেছে। চমকপ্রদ বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না। আগে এরকম অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই হয়তো ব্যাপারটা ওরকম মনে হয়েছে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক লাগতো।

রাতে ফ্ল্যাটের তিন বেডরুমে তিনজন ঘুমোয়। এখানে আসার দিন পাঁচেক বাদে হঠাৎ একদিন খুট খুট আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় অদিতির। আস্তে আস্তে দরজা খুলে সে অবাক। বিকাশ দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুমের ঘোর পলকে কেটে যায় অদিতির। সে বলেছে, 'তুমি!'

বিকাশ বলেছে, 'আমার ঘরে চলো।

বিকাশের আচ্ছন্ন চোখ চাপা অথচ তীব্র কণ্ঠস্বর বুঝিয়ে দিয়েছে, সে কী চায়। অদিতি শান্ত মুখে বলেছে, 'না।'

'তুমি তো বাজে সংস্কার মানো না।' বলতে বলতে বিকাশ আরেকটু এগিয়ে এসেছিল।

অদিতি বলেছে, 'তা হয়তো মানি না। তবে রুচির একটা প্রশ্ন আছে। তা ছাড়া—'

'কী?'

'তুমি যা চাইছো, মানসিক দিক থেকে আমি এখনও তার জন্যে প্রস্তুত হতে পারিনি।'

'ও।'

'তুমি শুয়ে পড় গিয়ে।'

তখুনি চলে যায়নি বিকাশ। আচমকা দুহাতে অদিতির মুখ তুলে ধরে গভীর আবেগে চুমু খেয়েছে। অদিতি বাধা দেয়নি।

তের

আরো মাস তিনেক কেটে যায়।

এর মধ্যে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অদিতিরা বিয়ে করেনি। বিয়ের জন্য মা প্রবল চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

টোকন প্রায়ই বালিগঞ্জের বাড়ির খবর দিয়ে গেছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় পুরনো চালেই ওখানকার সব কিছু চলেছে। কিন্তু ভেতরকার

অবস্থা নাকি ভাল নয়। সেখানে, টোকনের কথায় নাকি ফায়ার জ্বলছে। যে কোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। ইদানীং সিতাংশু ও-বাড়িতে যাচ্ছে না ঠিকই, তবে তলায় তলায় এমন কিছু ফন্দি আঁটতে থাকে যাতে বাবা এবং দুই দাদা ঘোর মুশকিলে পড়ে যাবে। সেজন্য সবাই তটস্থ হয়ে আছে।

মাঝে মাঝে অদিতিও বালিগঞ্জে চলে যায়। নানা কথার পর হেমলতা জিজ্ঞেস করেছেন, 'বিয়ের কী করলি?'

অদিতি বলেছে, 'করে ফেলবো। তুমি ভেবো না মা।'

এমন কি মৃণালিনী পর্যন্ত বলেছেন, 'এবার বিয়েটা করে ফেল বুবু।'

কীভাবে যেন গলফ গ্রীনে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল অদিতি আর বিকাশের সম্পর্কের ভেতর কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর যেমনটি হওয়া উচিত, তারা ঠিক তেমন নয়। চারপাশের ফ্ল্যাটের লোকজন তাদের দেখলে তেরছা চোখে তাকিয়েছে। এরা যেন বোঝাতে চেয়েছে, আমরা তোমাদের সব কিছু জানি। আমাদের চোখে তোমরা ধুলো ছিটোতে পারোনি।

এতো মানুষের বিরুদ্ধে কতক্ষণ নিজেদের ধ্যানধারণা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? চিরাচরিত প্রথা আর সংস্কার ভাঙা কি সহজ কথা। শেষ চাপটা ফের এসেছিল মায়ের কাছ থেকে।

হঠাৎ একদিন হেমলতা গলফ গ্রীনে চলে এসেছিলেন। আগে তিনি বলে-ছিলেন যতদিন না অদিতির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তিনি বিকাশের ফ্ল্যাটে আসবেন না।

মাকে দেখে যতটা খুশি হয়েছিল অদিতি, তার চেয়ে অনেক বেশি অস্বস্তি বোধ করেছে। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মা, তুমি হঠাৎ এলে যে?'

মৃদুভাষিণী হেমলতা সেদিন কঠোর স্বরে বলেছিলেন, 'তুমিই আমাকে আসতে বাধ্য করেছ।'

মা কী বলতে চান, বুঝতে অসুবিধে হয়নি অদিতির। সে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

হেমলতা এবার বলেছেন, 'তোমরা যা করছ তা অন্যায়, পাপ। তোমাদের বিয়ে করতেই হবে। লোকে নানা কথা বলছে। তাড়াতাড়ি বিয়েটা না করলে আমাকে বিষ খেয়ে মরতে হবে। কী চাও তুমি—আমার মৃত্যু?'

অদিতি বুঝতে পারছিল, মা তাকে মিথ্যে ভয় দেখাতে আসেননি। সে মাকে চেনে। তিনি যা বলেন, বিশেষ করে নিজের ব্যাপারে, সেটি করে ছাড়বেনই। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অদিতি বলেছে, 'ঠিক আছে, তুমি যা বললে তাই হবে।'

বিয়েটা সে করত ঠিকই, তবে আরো কিছুদিন বাদে। মায়ের তাড়াতেই সব কাজ ফেলে একদিন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে ছুটতে হয়েছিল। মাকে কষ্ট দিতে চায়নি অদিতি।

চাঁপারও একটা কাজ হয়ে গিয়েছিল। একটা মার্চেন্ট অফিসে ক্লাস ফোর স্টাফের চাকরি। ওটা যোগাড় করে দিয়েছিল রমেন। কাজটা বেশ হালকা। এক টেবল থেকে আর এক টেবলে ফাইল নিয়ে যাওয়া, অফিসারদের জল বা চা দেওয়া, এমনি সব টুকিটাকি কাজ।

চাঁপা চাকরিটা পেয়ে যাওয়ায় বাড়ির কাজ করার সময় খুব কম পেত। দুবেলা রান্নাই করত শুধু। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর মোছা—এ সবের জন্য আরো দুজন তোলা কাজের লোক রাখতে হয়েছিল।

চাঁপা রাঁধাবাড়া এবং খাওয়া দাওয়া সেরে দশটায় অফিসে চলে যায়, ফেরে ছুটির পর। তার দশটা-পাঁচটা ডিউটি। অদিতি তার নামে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছে।

বিয়ের পর দিনকয়েক মোটামুটি পুরনো রুটিনেই দিন কেটে যাচ্ছিল। তারপর দ্রুত পালটে যেতে থাকে বিকাশ। যে বিকাশকে অদিতি আগে চিনত সে যেন অন্য কেউ। তার ভেতর থেকে এমন একটি পুরুষ বেরিয়ে আসছিল যে প্রচণ্ড রক্ষণশীল, নিজের অধিকার বোধে অত্যন্ত সচেতন, স্ত্রী তার কাছে ব্যক্তিগত প্রপার্টির মতো। সে মনে করে স্ত্রী তার পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী চলবে ফিরবে উঠবে বসবে। বৈধ আইনসিদ্ধ বিয়েটা যেন স্ত্রীর ওপর অবাধ প্রশ্নাতীত মালিকানা তার হাতে তুলে দিয়েছে।

এ জাতীয় পুরুষ চারিদিকে আকছার দেখা যায় এবং চিরাচরিত প্রথায় মেয়েরা তাদের মেনেও নেয়, হয়তো বাধ্য হয়েই। সামাজিক প্যাটার্নটাই যে এইরকম। কিন্তু বিকাশের মধ্যে পুরুষশাসিত সমাজের এমন একজন মারাত্মক প্রতিনিধি যে আত্মগোপন করেছিল আগে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি অদিতি। সে একেবারে হকচকিয়ে গেছে। মানুষ চিনতে কী করে যে তার এত ভুল হয়ে গেল কে জানে। বিকাশকে বিয়ের জন্য তার কি কোনোরকম আক্ষেপ হয়েছে? এই প্রশ্নটার উত্তর আপাতত সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। বিকাশের মতিগতি শেষ পর্যন্ত কিরকম দাঁড়ায় তার জন্য কিছুদিন তো ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে।

বিয়ের মাসখানেক পর 'নারী-জাগরণ'-এর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে নিয়েছিল বিকাশ।

দু-চারদিন লক্ষ করার পর অদিতি জিজ্ঞেস করেছে, 'তুমি আজকাল আমাদের অর্গানাইজেশনে যাচ্ছ না যে? সবাই তোমার কথা বলছিল।'

বিকাশ নিরাসক্ত মুখে বলেছে, 'ওখানে আমি আর যাব না।'

'তার মানে !'

'আমি তো স্পষ্ট করেই বললাম, কোনোরকম হেঁয়ালি করিনি। বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।'

অদিতি জিজ্ঞেস করেছে, 'এতদিন তাহলে ওখানে যেতে কেন ?'

বিকাশ উত্তর দেয়নি।

একটু কী ভেবে অদিতি এবার বলেছে, 'আমার জন্যেই বোধ হয় যেতে—তাই না ?'

'ঠিক তা-ই। 'নারী-জাগরণ' টাগরণ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্ট নেই।'

অদিতি অবাক চোখে বিকাশের দিকে তাকিয়েছিল। লোকটার চেহারা তার কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

বিকাশ ফের বলেছে, 'আমার ইচ্ছে, তুমিও ওখানে যাবে না। এভাবে সময় আর এনার্জি নষ্ট করার মানে হয় না।'

অদিতি উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থেকেছে।

বিকাশ এবার বক্তৃতা দেবার ঢংয়ে বলেছে, 'দেশে গভর্নমেন্ট আছে। পলিটিক্যাল পার্টি, হাজার রকম অর্গানাইজেশন, ট্রাস্ট, ওয়েলফেয়ার সোসাইটি রয়েছে। তারা এসব নিয়ে মাথা ঘামাক। বিয়ের পর আমরা কোথাও বেড়াতে যাইনি। ভাবছি নেক্সট্ মান্থে গোয়া কি সাউথ ইন্ডিয়ায় যাব।'

অদিতি বলেছে, 'আমার এখন বেড়াবার সময় নেই।'

থতমত খেয়ে গেছে বিকাশ, 'সময় নেই !'

'না।'

'তোমার কলেজে তো প্রচুর ছুটি পাওনা রয়েছে।'

'এখন ছুটি নিতে পারব না।'

'কেন ?'

'অনার্সের কোর্স কমপ্লীট হয়নি। ওগুলো করিয়ে দিতে হবে।'

বিকাশ অদিতির কলেজের সব খুঁটিনাটি খবর রাখে। সে বলেছে, 'তোমার পেপারটা তো পড়িয়ে দিয়েছ।'

অদিতি বলেছে, 'একরকম। তবে অন্যদের পেপারগুলো বাকি রয়ে গেছে। সান্ত্বনাদির স্বামী মারা গেছেন আর মাধবীদি চার মাস ধরে ভীষণ অসুস্থ, বোধ হয় অপারেশন করতে হবে। ওঁদের পেপারগুলো আমাকে আর মীরাকে পড়িয়ে দিতে হচ্ছে।

চোখ কুঁচকে বিরক্ত মুখে বিকাশ বলেছে, 'অন্যের ক্লাস তুমি নেবে কেন ?'

প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেছে অদিতি। বিকাশ যে ভীষণ স্বার্থপর, সেটা তার কাছে আগেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতটা ভাবতে পারেনি। অনেকক্ষণ পর সে বলেছে, 'কলীগরা অসুবিধেয় পড়েছে। ফেলো ফীলিংটা থাকা দরকার। অসুখ-বিসুখ হলে ওরা আমার আর মীরার কত ক্লাস নেয়। তা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আমাদের টীচারদের দায়িত্বও তো আছে।'

চাপা বিদ্রূপের সুরে বিকাশ বলেছে, 'দায়িত্ব! বেশ।'

'নারী-জাগরণ'-এরও প্রচুর কাজ এসে পড়েছে।'

বিকাশ চকিত হয়ে উঠেছে। তার চোখ মুখে অসন্তোষ এবং রাগ ফুটে উঠেছে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে সে বলেছে, 'তোমাকে যে বললাম, 'নারী-জাগরণ' টাগরণ নিয়ে মাথা ঘামিও না। তবু তুমি ওখানে যাবে? ফালতু কাজ করে সময় ওয়েস্ট করবে?'

অদিতি বলেছে, 'কোনটা ফালতু আর কোনটা আর্জেন্ট, ইমপর্টান্ট, আমি জানি। তোমাকে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই।'

খানিকটা থতিয়ে গেছে বিকাশ, 'কী?'

'নারী-জাগরণ'-এর জন্যে আমি নিজেদের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি।'

'তুমি তো এসেছ চাঁপার জন্যে।'

'চাঁপার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল 'নারী-জাগরণ'-এর জন্যেই। আমার কাছে 'নারী-জাগরণ' আর চাঁপা এক।'

একটু চুপচাপ।

এবার বিকাশকে কিছুটা বিমর্ষ দেখিয়েছে। সে বলেছে, 'তা হলে কি বুঝব মতে না মিললে একদিন আমাকেও ছেড়ে চলে যাবে।' তার ঠোঁটে বিচিত্র ভঙ্গুর একটু হাসি ফুটে বেরিয়েছে।

'তোমাকে ছেড়ে যেতে হয়, তেমন কিছু করবে নাকি?'

বিকাশ উত্তর দেয়নি।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন অদিতির কলেজে ফোন করে সৈকত জানায়, 'আমাকে নর্থ বেঙ্গলে ট্রান্সফার করেছে।'

অদিতি চমকে উঠেছে, 'সে কি! হঠাৎ?'

'হঠাৎ নয়। অনেক দিন থেকেই একটা প্রোমোশানের ব্যাপার ঝুলে ছিল, কলকাতায় হায়ার পোস্টিং নেই, নর্থ বেঙ্গলে একটা খালি হয়েছে। তাই আর কি—'

'কবে যাচ্ছ?'

'পরশু। তুমি একটু সাবধানে থেকো।'

চকিতে নগেনের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে অদিতির। সে জিজ্ঞেস করেছে, 'তুমি কি সেই স্কাউন্ড্রেলটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ?'

নাম না করলেও সৈকতের বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

সৈকত এবার বলেছে, 'হ্যাঁ। আমার জায়গায় যে এখানে আসছে তার নাম সোমদেব সান্যাল। সোমদেবকে আমি তোমার কথা বলেছি। তেমন বুঝলে ওকে ফোন করো। হী ইজ কোয়াইট হেল্পফুল।'

'আচ্ছা—'

সৈকত চলে যাবার দিন সাতেক পর হঠাৎ একদিন সকালে সাঙ্গোপাঙ্গসুদ্ধ নগেন গলফ গ্রীনে হানা দিল। নিশ্চয়ই লোকটা অদিতিদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল। অদিতি চাঁপাকে নিয়ে এখানে চলে এসেছে, এ খবর তারা রাখে।

অকথ্য খিস্তি এবং হল্লা করতে থাকে তারা। উদ্দেশ্য, চাঁপাকে নিয়ে যাবে। বোঝা যায়, এতদিন সৈকত তাকে বোতলে আটকে রেখেছিল। এখন সে ফের বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এখানকার প্রতিবেশীদের মধ্যে গায়ে-পড়া কিছু মহিলা থাকলেও মোটের ওপর তারা মানুষ ভাল। সবাই হই হই করে বেরিয়ে এসে প্রথমে নগেনদের তাড়িয়ে দেয়। তারপর অদিতিদের কাছে জানতে চায়, এই অ্যান্টিসোসাল দলটার এভাবে হানা দেবার কারণ কী? অদিতি ফ্ল্যাটে সবাইকে ডেকে এনে চাঁপার ইতিহাস জানিয়ে দেয়। শোনার পর প্রত্যেকেই চাঁপার সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। বলে, 'আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। আবার যদি রাফায়েনগুলো আসে, আমাদের ডাকবেন। এখানে ইতরামো বজ্জাতি করতে দেওয়া হবে না।'

সোমদেবকেও ফোন করে ঘটনাটা জানায় অদিতি। কিন্তু সোমদেব সৈকত নয়। তার মধ্যে সাহস কম। নিশ্চয়ই নগেনকে যে রাজনৈতিক দাদাটি পুষছেন তিনি সোমদেবের হাতে পায়ে অদৃশ্য কিছু শিকল পরিয়ে দিয়েছেন। মিনমিনে গলায় সে বলেছে, 'দেখি কী করতে পারি।'

তার গলার স্বর শুনেই অদিতি বুঝে ফেলেছে, সোমদেবের পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়। যা করার তাকেই করতে হবে। এটাই ভরসা, প্রতিবেশীরা অন্তত তার পাশে আছে।

অদিতি একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছে, চাঁপার চাকরির ব্যাপারটা টের পায়নি নগেন। তাহলে গলফ গ্রীনে না এসে ওর অফিসে গিয়েই ঝঞ্ঝাট বাধাত। নগেনরা হানা দেবার পর থেকে রোজ নিজে চাঁপাকে সঙ্গে করে তার অফিসে পৌঁছে দিয়ে ছুটির পর নিয়েও আসে অদিতি। চাপার অফিসে নগেন সম্পর্কে সব জানিয়ে বলেছে, 'চাঁপার সিকিউরিটিটা আপনাদের

ওপর নির্ভর করছে। দয়া করে দেখবেন ওর যেন কোনোরকম ক্ষতি না হয়।'

অফিসার ইউনিয়ন, সাধারণ কর্মী থেকে সবাই অদিতিকে আশ্বাস দিয়েছে, নগেন ওখানে হুজ্জুত করতে গেলে তার হাড়মাংস আলাদা করে ছাড়বে।

বাইরের লোকেদের সহযোগিতা পেলে কি হবে, নগেনরা নতুন করে ঝামেলা করায় অদিতি আর বিকাশের ভেতর পুরনো অশান্তিটা ফের চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিকাশ বিরক্ত মুখে বলেছে, 'অনেক হয়েছে, চাঁপাকে এবার তাড়াও।'

অদিতি বলেছে, 'তাড়াবার জন্যে ওকে নিয়ে আসিনি।'

'কিন্তু ওই অ্যান্টিসোসালটা এখানকার ঠিকানা যখন জেনে গেছে তখন আবার আসবে।'

'আসতেই পারে।'

'তখন কে সামলাবে?'

'যারা সামলাবার তারাই সামলাবে।'

কটু গলায় বিকাশ বলে, 'তার মানে তুমি নেবারদের ওপর ডিপেন্ড করে আছ?'

অদিতি উত্তেজনাশূন্য মুখে বলে, 'ওরা সেদিন যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাতে ওদের ওপর ডিপেন্ড করাটা কি অনুচিত? চাঁপাকে বাঁচাতে যে এগিয়ে আসবে আমি তারই সাহায্য নেবো।'

বিকাশ আর কিছু বলেনি, থমথমে মুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিল শুধু।

এইভাবেই সময় কেটে যাচ্ছিল।

চৌদ্দ

একদিন রাত্তিরে খেতে খেতে বিকাশ বলে, 'একটা খবর শুনেছ!'

অদিতি পাতের দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্কর মতো খেয়ে যাচ্ছিল। ইদানীং, নগেন আর চাঁপার ব্যাপার নিয়ে যে তিক্ততা ঘটে গেছে, তারপর থেকে দুজনে খুব বেশি কথা বলে না। অদিতির মনে বেশ কিছুটা ক্ষোভ আর উত্তাপ জমা হয়েছে। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে অদিতি বলে, 'কী খবর?'

'তোমার দাদারা আর বাবা তোমাদের বাড়ি বেচে দিচ্ছেন।' বিকাশের চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা।

অদিতি চমকে ওঠে, 'কে বললে?'

বিকাশ জানায়, একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানির পার্টনারের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় আছে। বিকাশ যে ও বাড়ির জামাই, পার্টনার সেটা জানে। তার কাছে বিকাশ শুনেছে, রমাপ্রসাদরা নাকি তাদের কোম্পানিকে বাড়িটা পঁয়ত্রিশ লাখ টাকায় বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে।

অদিতি নিজের অজান্তে জিজ্ঞেস করে, রিয়েল এস্টেটের মালিক কে? সিতাংশু ভৌমিক?'

'না। অরুণোদয় সান্যাল।' বিকাশ বলে, 'সিতাংশু ভৌমিকটা আবার কে?'

'একজন কনট্রাক্টর। সে-ও পুরনো বাড়ি-টাড়ি কেনে।'

'ও।'

অদিতি বুঝতে পারে, কাউকে না জানিয়ে বাড়ি বেচে সিতাংশুর ধার শোধ করতে চাইছেন রমাপ্রসাদরা। সিতাংশুর কাছে বিক্রি করতে গেলে এত টাকা কিছুতেই পাওয়া যাবে না। যে টাকাটা তিন বাপ-ছেলেতে মিলে ঋণ করেছে, তার ওপর সামান্য কিছু দিয়ে বাড়িটা নির্ঘাত লিখিয়ে নেবে।

বিকাশ আবার বলে, 'ও বাড়িতে তোমারও তো অংশ রয়েছে।'

তার কণ্ঠস্বরে চকিত হয়ে ওঠে অদিতি। সে লক্ষ করে বিকাশের চোখ চকচক করছে। তার স্নায়ুগুলো মুহূর্তে টান-টান হয়ে যায়। অদিতি বলে, 'হয়তো আছে। কেন?'

'পঁয়ত্রিশ লাখ টাকায় বাড়িটা বিক্রি হলে তোমাদের কটা শেয়ার হবে বল তো?'

'অদিতি বলে, 'তা দিয়ে তোমার কোনো দরকার আছে?'

তার প্রশ্নটায় তীব্র একটা খোঁচা ছিল। বিকাশ তা গ্রাহ্য করে না। বলে, আজকাল বাপের বাড়ির প্রপার্টিতে মেয়েদেরও অধিকার থাকে। তোমার শেয়ারে যদি চার পাঁচ লাখ টাকাও আসে তা হলে দারুণ একটা প্ল্যান করা যায়।'

'কীসের প্ল্যান?'

'সল্ট লেকে কাঠা চারেক জমির চেষ্টা করব। আমার যা সোর্স আছে তাতে পেয়েও যাব। জমিটা পেলে এই ফ্ল্যাট বেচে দিয়ে ওখানে একটা বাংলো টাইপের বাড়ি—'

বিকাশের কথাবার্তা, আচরণ অনেকদিন ধরেই পছন্দ হচ্ছে না অদিতির। এই মুহূর্তে ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে তার ভেতরটা কুঁকড়ে যায়। লোকটা এত

লোভী, এমন স্বার্থপর, আগে টের পাওয়া যায়নি।

অদিতি উত্তর দেয় না। তবে বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা তার মাথায় কাঁটার মতো বিঁধে থাকে। বালিগঞ্জে গিয়ে এ বিষয়ে খোঁজখবর নিতে হবে।

বিকাশ এবার বলে, তোমার দাদারা যেরকম চীজ, তোমাকে ঠকাতে চেষ্টা করতে পারে। আমি কিন্তু ওদের ছেড়ে দেবো না, এটা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি।'

অদিতি স্থির চোখে বিকাশকে লক্ষ করছিল। সে শান্ত, অচঞ্চল ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে, 'ছেড়ে তো দেবে না, কী করবে তা হলে?'

বিকাশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'কী করব? আই শ্যাল গো টু দা কোর্ট'। টাকাটা আদায় করতেই হবে।' বলতে বলতে বাঁ হাতের চেটোয় প্রচণ্ড জোরে ডান হাতের ঘুষি বসায়।

বিকাশকে অত্যন্ত কুৎসিত আর হিংস্র দেখাচ্ছে। অদিতির ভাগের টাকার জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। অদিতি বলে, 'বাড়ি বিক্রি হলে টাকাটা আমার হবে। তুমি কোর্টে যাবে কোন অধিকারে?'

ধাবমান ঘোড়া দুরন্ত গতিতে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে ঘাড় গুঁজে পড়লে যেমন দেখায় ঠিক তেমন অবস্থা বিকাশের। বিভ্রান্তের মতো সে বলে, 'তোমার টাকায় কি আমার অধিকার নেই?'

অদিতি নীরস গলায় বলে, 'ওই টাকাটা আমি নেবো কিনা তার ওপর তো অধিকারটা নির্ভর করছে।'

শুনেও যেন বিশ্বাস হয় না বিকাশের। এমন অবাক জীবনে আগে আর কখনও সে হয়নি। বিমূঢ়ের মতো অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে বলে, 'তুমি অতগুলো টাকা ছেড়ে দেবে?'

'দিতেও পারি, আবার না-ও দিতে পারি। সব ডিপেন্ড করছে বাড়িটা নিয়ে বাবা আর দাদারা কী করতে চাইছে তা জানার ওপর।'

'বললাম তো ওরা বাড়িটা বিক্রি করে দেবে।'

'আমার মনে আছে। তোমার চেনা সেই প্রোমোটারের পার্টনার ঠিক বলছে কিনা সেটা আগে জানা দরকার।'

'কীভাবে জানবে?'

'সে জন্যে আমাকে বালিগঞ্জে যেতে হবে।'

গভীর আগ্রহে বিকাশ জিজ্ঞেস করে, 'কবে যাবে বালিগঞ্জে?'

অদিতি বলে, 'ভাবছি কালই যাব।'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল।' অদিতির কাছে ঘন হয়ে বসে তার একটা হাত তুলে নিয়ে বিকাশ বলে, 'আর শোনো, টাকাটা যদি সত্যিই

আসে নিয়ে নিও। মোটেও পাগলামি করবে না।'

আদিতি উত্তর দেয় না।

কাল রাতে অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি অদিতির। শুয়ে শুয়ে সে ঠিক করে ফেলেছিল, আজ সকালেই বালিগঞ্জ চলে যাবে কিন্তু ঘুম ভাঙার পর সিদ্ধান্তটা পাল্টে ফেলে। আপাতত সে নিজে যাচ্ছে না, টোকনকে পাঠিয়ে ঠিক খবরটা জেনে আসতে বলবে।

কলেজে গিয়ে সেই অনুযায়ী প্রথমে টোকনের ফ্যাক্টরিতে ফোন করে অদিতি। বার দুই ডায়াল করতেই লাইনটা পাওয়া যায়। অদিতি বলে, 'আজ ছুটির পর তোর কোনো কাজ আছে ?'

টোকন বলে, 'না। কেন রে ছোটদি ?'

'তুই আজ একবার বালিগঞ্জে যাবি। সবার, বিশেষ করে পিসির সঙ্গে দেখা করে একটা খবর তোকে আনতে হবে।'

'কী খবর ? কিছু গোলমাল হয়েছে ?'

কোন খবরটা প্রয়োজন বিশদভাবে তা জানিয়ে দিয়ে অদিতি বলে, 'বালিগঞ্জ থেকে সোজা গলফ গ্রীনে চলে আসবি।'

টোকন বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

রাত্তিরে টোকন এসে জানায়, বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা নির্ভুল। খদ্দের ঠিক হয়ে গেছে। আটকে আছে একটা কারণে। শিবপ্রসাদের উইল অনুযায়ী তাঁর জীবিত বংশধরদের প্রত্যেকের এ বাড়িতে সমান অধিকার থাকবে। কোনো কারণে যদি বাড়ি বিক্রি করতে হয় সকলের লিখিত সম্মতি নিতে হবে। কিন্তু পিসি কিছুতেই বাড়ি বেচতে রাজী নন। ফলে তাঁর ওপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হচ্ছে।

টোকন বলে, 'জানিস তো পিসি কেমন একরোখা আর জেদী। ওঁর কনসেন্ট পাওয়া ইমপসিবল।'

উদ্বিগ্ন মুখে অদিতি বলে, 'পিসির ওপর কি খুব বেশি টরচার হচ্ছে ?'

'এখনও ততটা করেনি। তবে রোজই জেঠামশাই আর দুই দাদা চেঁচামেচি করছে।'

'আমার কি দু-একদিনের ভেতর ওখানে যাওয়া দরকার ?'

'পিসি বলল, তেমন বুঝলে খবর পাঠাবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর অদিতি বলে, 'বাড়ি বিক্রি করতে হলে আমার আর ছোটদির মতামতও দরকার। কই, ওরা তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। ছোটদির কনসেন্ট নিয়েছে কিনা জানিস ?'

টোকন মাথা নাড়ে, 'না। পিসি কিছু বলেনি।'

'ঠিক আছে।' বলে একটু ভেবে আবার শুরু করে অদিতি, 'অনেকদিন আগে একবার বলেছিলি তোর এক বন্ধুর দাদা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট—'

'হ্যাঁ, অরুণদা—অরুণ চ্যাটার্জি বিরাট ল ইয়ার।'

'যদি দরকার হয়, তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারবি?'

অবাক হয়ে টোকন বলে, 'ল' ইয়ারের কাছে যেতে চাইছিস! কেস ফেস করবি নাকি?'

অদিতি বলে, 'এক্ষুনি বলতে পারছি না। নিয়ে যেতে পারবি কিনা সেটাই বল—'

'নিশ্চয়ই পারব।'

'তেমন বুঝলে লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিতে হতে পারে। খুব বেশি ফী টী কিন্তু দিতে পারব না।'

'অরুণদা ইজ আ নাইস ফেলা। অন্য উকিলদের মতো অত পয়সার খাঁই নেই।'

'তুই আবার কবে আসছিস?'

'যেদিন বলবি।'

খানিক চিন্তা করে অদিতি বলে, 'তিন চারদিনের ভেতর তোর ফ্যাক্টরিতে ফোন করছি।'

টোকন বলে, 'ও. কে ম্যাডাম।'

পনের

টোকন সেদিন বালিগঞ্জ থেকে যে খবর নিয়ে এসেছিল, তারপর থেকে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছে অদিতি। পিসি যে বাড়ি বিক্রিতে একেবারেই রাজী হবেন না, আগেই তা আন্দাজ করেছিল। কাজেই তার ওপর মানসিক নির্যাতন শুরু হয়েছে। বাবা এবং দাদারা কতটা বাড়াবাড়ি করছে সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। তবে মৃণালিনী যদি জেদ বজায় রাখেন, উৎপাতের মাত্রাটা বাড়তে থাকবে। অসুস্থ, পঙ্গু একটি মানুষের পক্ষে কতদিন সেটা সহ্য করা সম্ভব, কে জানে। হয়ত চাপের মুখে নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ওদের ইচ্ছানুযায়ী সই করে দিতে হবে।

মৃণালিনী জানিয়েছেন, তেমন বুঝলে অদিতিকে খবর দিয়ে বালিগঞ্জে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আর দেরি করা বোধ হয় ঠিক হবে না। খুব তাড়াতাড়িই অদিতির সেখানে যাওয়া দরকার।

অবশ্য মৃণালিনীর সই-ই শেষ কথা নয়। তার এবং ছোটদি সুজাতার মতামতও বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে ভীষণ জরুরি। বড়দি সুদীপার সই না পাওয়া গেলেও চলবে। সে দেশে থাকে না, বছর পনের আগে স্বামীর সঙ্গে কানাডায় চলে গেছে। ওরা ওখানকার ন্যাশনালিটি নিয়েছে। বড়দি একটা ইউনিভারসিটিতে পড়ায়, প্রবালদা অর্থাৎ বড় জামাইবাবু নাম-করা সার্জেন। দেদার রোজগার। ওদের এক ছেলে এক মেয়ে। অদিতিদের বংশের এই একটি মাত্র মেয়েরই বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছে। অজস্র টাকা, অঢেল আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি ছেড়ে কোনোদিনই বড়দিরা ইন্ডিয়ায় ফিরে আসবে না। অনেক দিন আগেই ওরা তো জানিয়ে দিয়েছে, বালিগঞ্জের বাড়ি বা পৈতৃক প্রপার্টির ভাগ তাদের চাই না। রমাপ্রসাদরা তাদের অংশ যাকে ইচ্ছা দিতে পারেন।

টোকন খবর দিয়ে যাবার পরদিনই সুজাতাকে ফোন করেছিল অদিতি। ছোটদির শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাপের বাড়ির সঙ্গে তাকে কোনোরকম সম্পর্ক রাখতে দেয়নি। দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ। বিয়ে অন্নপ্রাশন শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে দায়সারা ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দু পক্ষই কর্তব্য পালন করে থাকে। কোনো অনুষ্ঠানে যাবার প্রশ্নই নেই।

দুই পরিবারের মধ্যে যে সম্পর্কটি অনেক আগেই চুরমার হয়ে গেছে তা মেরামত করে কাজ-চলা গোছের করে তোলার অনেক চেষ্টা করেছে অদিতি। নিজে বেশ কয়েকবার ছোটদির শ্বশুরবাড়ি গেছে, ভদ্রতা বা সৌজন্যের অভাব হয়নি, কিন্তু ও-বাড়ির লোকেদের মধ্যে যা পাওয়া যায়নি তা হল আন্তরিকতা। সে যে ওখানে অবাঞ্ছিত সেটা চোখে আঙুল দিয়ে না হলেও আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে একতরফা যাওয়া যায় না। অগত্যা মাঝে মধ্যে ছোটদিকে ফোন করে যোগাযোগটা রেখে গেছে অদিতি। তার কাছ থেকেই বাড়ির সবার খবর নেয় সুজাতা।

সেদিন অদিতি জিজ্ঞেস করেছিল, 'ছোটদি, তুই কি জানিস, আমাদের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে?'

সুজাতা বলেছিল, 'কই না তো!'

'তোর কি মনে আছে, দাদু যে উইল করে গিয়েছিলেন তাতে তাঁর বংশ-ধরদের যারা যারা বেঁচে থাকবে তাদের কনসেন্ট ছাড়া বাড়ি বিক্রি করা যাবে না?'

'কি জানি, মনে পড়ছে না।'

'মনে করে রাখ, এই শর্তটাই আছে। বাবা আর দাদারা তোর সইও চায় নি, আমারও না। মনে হয় আমাদের গোপন করে বেচতে চাইছে। মানে

ভাগীদার বাড়াতে চায় না।'

সুজাতা বলেছে, 'আমি না হয় দূরে থাকি, ও-বাড়ি যাই না। কে কী করছে না করছে জানতে পারি না। তুই ওখানে থাকিস, তোকে গোপন করবে কী করে?'

অদিতি হকচকিয়ে যায়। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আমি এখন বালিগঞ্জের বাড়িতে থাকি না রে ছোটদি।'

'কোথায় থাকিস তা হলে!' সুজাতা যে অবাক হয়েছে, তার গলার স্বর শুনেই বোঝা যায়।

'গলফ গ্রীনে।' নিচু গলায় বলে অদিতি।

'হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে গলফ গ্রীনে? কী ব্যাপার বে বুবু?'

'পরে বলব।'

সুজাতা তবু জিজ্ঞেস করে, 'বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া করে চলে যাসনি তো?'

ছোটদি যে তার জন্য রীতিমত উৎকণ্ঠিত, সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। অদিতি বিব্রতভাবে বলে, 'বললাম তো, পরে বলব। কয়েক দিন পর তোর বাড়ি যাচ্ছি, তখন শুনিস। আর হ্যাঁ, বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা তোর শ্বশুর-বাড়িতে এখন জানাস না।'

'পাগল নাকি? জানতে পারলে এখনই টাকার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যা লোভী আর স্বার্থপরের গুষ্ঠি!'

'এখন রাখছি। কী হয় না হয়, পরে ফোন করে কি নিজে গিয়ে তোকে জানাবো।'

'আচ্ছা।'

সুজাতাকে ফোন করার দিন তিনেক বাদে বিকাশ অফিসে চলে গেছে, অদিতি চাঁপাকে নিয়ে বেরুতে যাবে, হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে দুর্গা উদ্‌ভ্রান্তের মতো এসে হাজির। তাকে দেখে মনে হয়, কোনো কারণে ভীষণ ভয় পেয়েছে।

এর আগে দুর্গা গলফ গ্রীনে কখনও আসেনি। অদিতি যত না অবাক, তার চেয়ে অনেক বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অদৃশ্য কোনো বিপদের সংকেত যেন পেয়ে যায় সে।

দুর্গা দমবন্ধ গলায় বলে, 'জানো ছোটদি, খুব ঝঞ্ঝাট হয়ে গেচে। তোমাকে এক্ষুনি ও-বাড়ি যেতে হবে।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে অদিতি বলে, 'আগে বসে জিরিয়ে নে। তারপর সব শুনছি।'

দুর্গা খানিকটা সুস্থ হলে অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'এখানকার ঠিকানা পেলি

কোথায় ? এলি কী করে ?'

দুর্গা জানায় মৃণালিনী একটা চিঠি লিখে ঠিকানা দিয়ে তাকে পাঠিয়েছেন। চিঠিটা অত্যন্ত জরুরি। দুর্গার কাছ থেকে সেটা নিয়ে অদিতি এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে।

'স্নেহের বুবু,

আমি খুবই বিপন্ন। চিঠি পাওয়ামাত্র আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবি। সাক্ষাতে সব কথা বলব। ইতি পিসি।'

মৃণালিনীর বিপদের কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না অদিতির। দুর্গাকে জিজ্ঞেস করলে সমস্ত জানা যায় কিন্তু পিসির ব্যাপারে সে কোনো প্রশ্ন করে না। শুধু বলে, 'তুই যে আমার কাছে এসেছিস, পিসি ছাড়া আর কেউ জানে ?'

দুর্গা মাথা নাড়ে, 'না ছোটদি, আমি লুকিয়ে এসেচি।'

'এক কাজ কর, তুই এক্ষুনি চলে যা। বাস ভাড়ার পয়সা আছে ?'

'আচে, কিন্তু তুমি ?'

'আমি কী ?'

'তুমি যাবে না ?'

'আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

'তাড়াতাড়ি চলে যেও কিন্তু। ও বাড়িতে পিসিমার ওপর কী হুজ্জুত যে চলচে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।'

সেটা আগেই আন্দাজ করে নিয়েছে অদিতি। নির্যাতনটা কেমন পর্যায়ে পৌঁছুলে মৃণালিনীর মতো অনমনীয় একরোখা মানুষ নিজের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে চাইছেন সেটা ভেবে মন খারাপ হয়ে যায় তার।

দুর্গা ফের বলে, 'তুমি কটার সময় যাবে ?'

অদিতি বলে, 'কেন ?'

'পিসিমাকে জানাবো।'

ঘড়ি দেখে অদিতি বলে, 'এখন দশটা পঁয়ত্রিশ, বারোটা সাড়ে-বারোটায় পৌঁছে যাবো।'

দুর্গা চলে যায়।

তারপর অদিতি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। মৃণালিনীর মতো একজন পঙ্গু মানুষকে নিয়ে আসা সহজ নয়। তাঁকে কোলে করে নামিয়ে ট্যাক্সি ডেকে তুলতে হবে। তা ছাড়া গলফ গ্রীনে এসেও তাদের এই তিন তলার ফ্ল্যাটে উঠিয়ে আনা মুখের কথা নয়। এর জন্য শক্তসমর্থ একজন পুরুষ মানুষের দরকার। বিকাশ বাড়ি থাকলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেত। ও-বাড়ির লোকেরা যেভাবে মৃণালিনীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে তাতে

তাদের সাহায্য নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না।

ভাবতে ভাবতে টোকনের কথা মনে পড়ে যায়। এখানে প্রায় সব ফ্ল্যাটেই ফোন রয়েছে। অদিতি দ্রুত চারতলায় সান্যালদের ফ্ল্যাটে গিয়ে ডায়াল করতেই টোকনকে তার ফ্যাক্টরিতে পেয়ে যায়।

টোকন বলে, 'কী ব্যাপার রে ছোটদি ?'

অদিতি জিজ্ঞেস করে, 'তুই একবেলা ছুটি নিতে পারবি ?'

'পারবো। কেন ?'

'পিসিকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে। একা পারবো না, তোর হেল্প দরকার।'

'কী হয়েছে পিসির ?' টোকনকে দেখা না গেলেও সে ভীষণ উৎকণ্ঠিত, তার গলা শুনে সেটা টের পাওয়া যায়।

অদিতি বলে, 'ঠিক কী হয়েছে, বলতে পারবো না। তবে গেস করছি, পিসির ওপর খুব টরচার হচ্ছে।'

টোকন চট করে কিছু একটা বুঝে নেয়। বলে, 'ছোটদা বড়দা আর জেঠামশাই এতো নিচে নেমে গেছে, চিন্তাই করা যায় না।'

একটু চুপ করে থেকে অদিতি বলে, 'তুই একটা ট্যাক্সি নিয়ে বালিগঞ্জে চলে যাবি। ও-বাড়ির গেটের কাছে ওয়েট করবি। আমি এখনই বেরিয়ে পড়ছি। আধ ঘণ্টার ভেতর ওখানে পেঁছে যাবো।'

'আচ্ছা।'

ষোল

বালিগঞ্জে নিজেদের বাড়ির সামনে আসতেই অদিতির চোখে পড়ে টোকন এর মধ্যেই পেঁছে গেছে, গেটের কাছে একটা ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছে।

চিরকাল অদিতি দেখে আসছে টোকনের দায়িত্ববোধ অসীম। তার ওপর কোনো কাজের ভার দিলে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। প্রথমে সে ঠিক করেছিলো, টোকনকে সঙ্গে করে বাড়িতে ঢুকবে এবং দুজনে ধরাধরি করে পিসিকে নিয়ে আসবে। পরে ভেবেছে, ওকে এর ভেতর জড়ানো ঠিক হবে না। তার আর পিসির জন্য এ বাড়ির সঙ্গে টোকনের সম্পর্ক নষ্ট হোক, এটা ঠিক নয়। অদিতি বলে, 'দশ মিনিটের ভেতর আমি পিসিকে নিয়ে আসছি।'

টোকন বলে, 'আমি তোর সঙ্গে যাবো ?'

'দরকার নেই। তুই এখানেই থাক।'

বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই প্রথমে বরুণের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তারপর রমাপ্রসাদের সঙ্গে। দুজনেই অদিতিকে দেখে চমকে ওঠে। সে যে হঠাৎ এইসময়ে এখানে চলে আসবে, এটা ছিলো তাদের পক্ষে অভাবনীয়। দুজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে, 'কী চাই?'

অদিতি বলে, 'পিসিকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

বরুণ বলে, 'তার মানে?'

'মানে আবার কী। পিসি এখন থেকে আমার কাছে থাকবে।' বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে অদিতি।

বরুণ চিৎকার করে ওঠে, 'পিসি এখানেই থাকবে। নিয়ে যেতে দেবো না।'

এখানে আসার সময় অদিতি ভেবেছিলো কোনো কারণেই উত্তেজিত হবে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাথা ঠাণ্ডা রাখা যাবে না। তীব্র চাপা গলায় সে বলে, 'এখানে পিসিকে রাখতে পারলে পঙ্গু মানুষটাকে প্রেসার দিয়ে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেওয়া যায় তাই না? সেটা আমি করতে দেবো না।'

রমাপ্রসাদ বলেন, 'কী বলছিস বুবু! কাজ গুছিয়ে নিতে চাই—এর মানে?'

'মানেটা আমার চেয়ে তোমরা অনেক ভাল করেই জানো।'

অদিতি যা বলতে চায়, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে। তার কথায় ঘোরপ্যাঁচ নেই। রমাপ্রসাদ থতমত খেয়ে যান। তিনি আর কিছু বলেন না।

চেঁচামেচি শুনে মীরা বন্দনা মৃগাঙ্ক হেমলতা দুর্গা—চারপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। হেমলতা আর দুর্গা ছাড়া বাকি সবার চোখে আগুন জ্বলছে।

অদিতি সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। মৃগাঙ্ক গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'পিসিকে নিয়ে যেতে পারবি না।' তার বুকে এখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে। সেই অবস্থাতেই উত্তেজিতভাবে একসঙ্গে দু-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে টপকে অদিতির দিকে এগিয়ে যায়।

মৃগাঙ্কর দেখাদেখি বরুণ আর রমাপ্রসাদও অদিতির দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ অদিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে কঠোর গলায় বলে, 'আমাকে বাধা দিও না। কেউ যদি পিসিকে আটকাতে চেষ্টা করো আমি সোজা আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে সব মেম্বারকে ডেকে আনবো। তাতেও যদি কাজ না হয় থানায় চলে যাবো। সেটা কিন্তু তোমাদের পক্ষে ভাল হবে না।'

মৃগাঙ্করা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বরুণ হাততালি দিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলে, 'চমৎকার। বাপ দাদাদের পুলিশের ভয় দেখাচ্ছে! চমৎকার!'

'বাপ দাদারা যদি পুলিশের কাছে যেতে বাধ্য করায়, আমি নিরুপায়।

মীরা দোতলার ল্যান্ডিংয়ের এক কোণ থেকে বলে ওঠে, 'চলে গিয়েছিল, ভেবেছিলাম হাড় জুড়লো। এখন দেখছি যতদিন বেঁচে থাকবে, আমাদের জ্বালিয়ে মারবে।'

বন্দনা মুখ মচকে বলে, 'যা বলেছিস!'

অদিতি অল্প হেসে বলে, যতই আমার মৃত্যুকামনা করো, খুব সহজে আমি মরছি না।' বলতে বলতে মৃণালিনীর ঘরে চলে যায়।

মৃণালিনী ব্যাকুলভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে শুয়ে ছিলেন। অদিতিকে দেখামাত্র বলেন, 'তুই এসেছিস, বাঁচলাম বুবু। ওরা আমার ওপর যা নির্যাতন—'

পিসিকে থামিয়ে দিয়ে অদিতি বলে, 'আমি সব জানি পিসি। তোমাকে কিছু বলতে হবে না।'

মৃণালিনী বলেন, 'টাকার জন্যে সব অমানুষ হয়ে গেছে!'

অদিতি তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী কী তোমার সঙ্গে নেবে বলো? সব গুছিয়ে নিচ্ছি—'

মৃণালিনীর কথামতো খানকতক জামা-কাপড় দু-চারখানা গয়না, ব্যাঙ্কের পাস-বই আর চেক-বই, বিবেকানন্দ রচনাবলী ছাড়াও টুকিটাকি আরও কটা জিনিস সুটকেসে ভরে ফেলে অদিতি। এ বাড়ির কারও সাহায্য পাওয়া যাবে না, সে জানে। হেমলতা বা দুর্গার ইচ্ছা থাকলেও রমাপ্রসাদের ভয়ে এগিয়ে আসার সাহস নেই। যা করার একা অদিতিকেই করতে হবে। মৃণালিনীকে কোলে তুলে এক হাতে জড়িয়ে রাখে সে, আর এক হাতে সুটকেসটা ঝুলিয়ে নিচে নামতে থাকে।

দোতলায় আসতেই রমাপ্রসাদ কর্কশ গলায় মৃণালিনীকে বলেন, 'একটা কথা মনে রেখো, এ-বাড়ির দরজা চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেলো।'

মৃণালিনী বলেন, 'তুমি ভুলে গেছো, এ বাড়িতে তোমার যতটা অধিকার, আমারও ততটাই। আমার যখন ইচ্ছে হবে আবার চলে আসবো।'

সবাই সিনেমার স্থির চিত্রের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু হেমলতা আর দুর্গা অদিতিদের সঙ্গে একতলায় নেমে গেট পর্যন্ত চলে আসে।

ট্যাক্সিতে ওঠার আগে হেমলতা বলেন, 'পিসিকে নিয়ে গিয়ে খুব ভাল করলি বুবু। এখানে থাকলে ঠাকুরঝিকে বাঁচানো যেতো না।'

রাত্তিরে অফিস থেকে ফ্ল্যাটে ফিরে মৃণালিনীকে দেখে কপাল কুঁচকে যায় বিকাশের। তাঁর সঙ্গে একটি কথাও না বলে অদিতিকে ডেকে তাদের বেডরুমে নিয়ে যায়। থমথমে মুখে জিজ্ঞেস করে, 'এর মানে কী?'

অদিতি পাল্টা প্রশ্ন করে, 'কীসের?'

'এই ওল্ড ডিজিজড মহিলাটিকে এখানে এনে তুললে যে ?'

'মহিলাটি আমার পিসি, সেটা মনে রেখো।'

'ঠিক আছে।'

অদিতি বলে, 'উপায় ছিল না, তাই পিসিকে আনতে হয়েছে।'

বিকাশ বলে, 'উপায় ছিল না কেন ?'

কারণটা জানিয়ে অদিতি বলে, 'অন্যায়ভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে বাড়িটা বিক্রি বা মর্টগেজ করতে দেবো না।'

বিমূঢ়ের মতো বিকাশ জিজ্ঞেস করে, 'তা হলে তোমার ভাগের টাকাটা ?'

'টাকা আবার কী! বাড়ি বিক্রি হলে তবে তো টাকা।'

হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটায় বিকাশ। চিৎকার করে বলে, 'তোমাদের দিক থেকে কানাকড়িও পাবো না। এদিকে যখন যাকে খুশি এখানে এনে তুলছ। ভেবেছ কি—এটা ধর্মশালা, না রিফিউজি ক্যাম্প? এখানে এসব চলবে না।'

বিকাশের আদত চেহারাটা কিছুদিন ধরেই অদিতির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ফলে সে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত বা বিচলিত হয় না। অনেকক্ষণ পর গম্ভীর গলায় শুধু বলে, 'ঠিকই বলেছ। ভেবে দেখলাম, আমারও এভাবে চলবে না। কয়েকদিন সময় দাও। তার ভেতর চাঁপা আর পিসিকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব।'

বিকাশ হকচকিয়ে যায়। 'তোমাকে তো যাবার কথা বলিনি।'

অদিতি উত্তর দেয় না, তবে এ বিষয়ে মনস্থির করে ফেলে।

মৃণালিনীকে গলফ গ্রীনে নিয়ে আসার পর দিন চারেক কেটে গেছে। ওর মধ্যে টোকনের সঙ্গে একদিন তার দাদার বন্ধু অ্যাডভোকেট অরুণ ভট্টাচার্যর কাছে চলে যায় অদিতি। তার আগে সুজাতার সঙ্গে দেখা করে তার সই নিয়ে এসেছিল, মৃণালিনীর সইয়ের ব্যাপারে সমস্যা নেই, তিনি তার কাছেই থাকেন।

বালিগঞ্জের বাড়িটা যাতে রমাপ্রসাদরা বিক্রি বা মর্টগেজ না করতে পারেন সে জন্য কোর্ট থেকে ইনজাংসনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় অরুণকে। অরুণ জানান, মৃণালিনী সুজাতা এবং অদিতি যখন আপত্তি জানাচ্ছে, কোর্ট থেকে ইনজাংসন পেতে অসুবিধা হবে না।

অরুণ ভট্টাচার্য মানুষটি হৃদয়বান, অন্য ল ইয়ারদের মতো নয়। তিনি শুধু স্ট্যাম্পড কাগজ, কোর্ট ফী ইত্যাদি বাবদ যা খরচ হবে, সেটুকুই নেবেন, আপাতত নিজের পারিশ্রমিক নেবেন না।

ইনজাংসনের ব্যবস্থা করার পর টোকন আর অদিতি ঘুরে ঘুরে দালাল

ধরে যাদবপুরে একটা মাঝারি ফ্ল্যাট ভাড়া করে ফেলে। যেদিন সে চাঁপা আর মৃণালিনীকে নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠে যাবে, বিকাশ প্রায় ভেঙে পড়ে। বলে, 'সত্যিই তুমি চলে যাবে?'

অদিতি শান্ত মুখে বলে, 'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু—কিন্তু—'

'কী?'

'তুমি কি ডাইভোর্স করতে চাও?'

'এই মুহূর্তে সে ব্যাপারে কিছু ভাবিনি। এক বছর সময় দিলাম। এর ভেতর তোমাকে স্থির করতে হবে আমার কোনো কাজে বাধা দেবে কিনা। আপাতত আলাদা থাকাই ভাল।'

টোকন একটা গাড়ি ঠিক করে দিয়েছিল। মৃণালিনীদের নিয়ে নতুন বাড়ির দিকে যেতে যেতে অদিতি বুঝতে পারে তার জন্য চারপাশে অসংখ্য রণক্ষেত্র সাজানো রয়েছে। যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তার।